॥ হিন্দুধর্ম্ম পরিচয় ॥
শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০১১

৪র্থ সংস্করণ
জানুয়ারী ১৯৯৪

প্রচ্ছদ ঃ
নিখিল ঘোষাল

মূল্য— , টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০ ২

উৎসর্গ

ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভিন্ন জাতীয়তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা অসম্ভব,
এই সত্য যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই
৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির
উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা
উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তকখানি দুই খণ্ডে ১৩৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকখানির বিস্তৃত প্রচার হয় নাই। বর্ত্তমানে আইন করিয়া আমাদের রাষ্ট্রকে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে এবং আমরা স্বাধীন হইলে আমাদের সর্ব্বজন-সমাদৃত ধর্ম্ম সরকারীভাবে বালক-বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এই আশা উন্মূলিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন এবং স্থূলদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী শাখা এবং নীতিতে যে মূল ঐক্য বিদ্যমান এবং হিন্দুধর্ম্মের ও আচার-ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যে ভিত্তি আছে, তাহার সহিত সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের পরিচয় করাইয়া দেওয়া ও ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যে প্রয়োজন, ইহা চিন্তাশীল হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

যে উদ্দেশ্য লইয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল, তাহা আংশিকভাবেও সফল হইয়াছে, এমত বলিতে পারি না। তত্রাচ মরুভূমিতে জলান্বেষণকারী কূপ-খনকের ন্যায় কাজ চালাইয়া যাওয়াই সঙ্গত মনে করি। বিশ্বাস আছে যে, আমরা ভারতীয়, যদিও আমরা বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য হইতে ধার করা আপাত-মনোহর মতবাদসমূহের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ও পারিবারিক জীবন হইতে ধর্ম্ম বাদ দিতে উদ্যত হইয়াছি, একদিন আমাদের অবচেতনমনে ধর্ম্মের যে দৃঢ় ভিত্তি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা সময়োপযোগী উপদেশের ফলে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং এই পুস্তকখানি সাধারণের সমাদর লাভ করিবে।

ইতি— ১৩৫৬ সাল, কার্ত্তিক।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আজকাল আমাদের যে সরকারী শিক্ষানীতি প্রচলিত, তাহাতে ধর্ম্মের স্থান নাই ; অথচ ধর্ম্ম-শিক্ষাই সমাজ-বন্ধন এবং ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঐক্য ও সঙ্ঘ-শক্তির মূল। হিন্দু-ধর্ম্মাবলী ভিন্ন অন্য সকলে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া, তাহাদের বালকগণকে নিজ নিজ ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে। একমাত্র হিন্দুই এই বিষয়ে উদাসীন। ফলে হিন্দু বালক-বালিকারা তাহাদের মহৎ এবং গৌরবপ্রভা-সমুজ্জ্বল ধর্ম্মের বিষয়ে কিছু জানে না, নিজ ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে, অপ-ব্যাখ্যা করে, এবং নিজেদের হিন্দু বলিতে লজ্জা বোধ করে, ও তাহাদের নেতাগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর গৃহে জন্ম দৈবক্রমে (Accident) ঘটিয়াছে বলিয়া লজ্জিত হন।

বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত না হইলে, বৃহত্তর ঐক্যের কল্পনা বাতুলতা মাত্র। নানা কারণে বেঙ্গল ডেভেলপমেণ্ট সোসাইটী, হিন্দু বালকগণকে তাহাদের নিজ ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর দেখা গেল যে, সকল শ্রেণীর উপযোগী হিন্দুধর্ম্ম-পরিচায়ক কোন গ্রন্থ নাই। তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী লেখক এই গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন। যাহাতে বালকেরা নিজ ধর্ম্মের এবং পূজাদি অনুষ্ঠানের, ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল সূত্রের সহিত পরিচিত

হয়, এবং আবশ্যক হইলে নিজ ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচার ও পদ্ধতির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান ও দেবী সরস্বতীর শরণ লইয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ পঠন-পাঠন দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দশজনও হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান হইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে।

ইতি—

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

—

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

১ম ভাগ

প্রথম পাঠ

ঈশ্বর

জগতে যাহা কিছু দেখ, সব জিনিষেরই কারণ আছে। আমরা সকল সময় কারণ জানি না, বা বুঝিতে পারি না সত্য, কিন্তু চেষ্টা করিলে জানিতে পারি।

তোমরা সকলেই গাছ দেখিয়াছ। একটি বড় গাছের কথা মনে কর। ঐ গাছ তোমরা বাল্যকাল হইতে দেখিতেছ, তোমরা জন্মাইবার পূর্ব্বে তোমাদের পিতারাও হয়ত দেখিয়াছেন। ঐ গাছ সম্বন্ধে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তোমরা বলিবে যে, ঐ গাছের বীজ ওখানে হইয়াছিল বা পড়িয়াছিল, তাহা হইতে গাছ জন্মিয়াছে। যদিও তোমরা কেহ দেখ নাই, বীজ হইতে গাছ হয় জানা আছে বলিয়া, তোমরা ঐরূপ বলিলে। কিন্তু সব বিষয় তো জানা নাই। যেমন মাটীর নীচে পাথুরে কয়লা পাওয়া যায়, উহার কারণ কি, জানা ছিল না। প্রথমে লোকে বলিত—উহার আবার কি কারণ, পাওয়া যায়, এই দেখি।

যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন, তাঁহারা কারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জানিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবী বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন জলা ও জঙ্গলময় ছিল, তখন প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন বশতঃ ঐ জঙ্গল মাটীর নীচে চাপা পড়ে, এবং উপরের চাপে ও উত্তাপে জঙ্গলই পাথুরে কয়লা হইয়াছে। যাঁহারা এই সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ ঐরূপ হইতে দেখেন নাই বা কাহারও নিকট শুনেন নাই। কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার কারণ নির্ণয় করিতে বিজ্ঞান অসমর্থ—যথা, সূর্য্য নীহারিকা গ্রহ নক্ষত্র কোথা হইতে আসিল? ইহাদের উপাদান বা কোথা হইতে আসিল? ইহাদের গতি ও অবস্থান কে স্থির করিয়া দিল? সূর্য্য যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদিত হয় এবং সন্ধ্যায় অস্ত যায়, চন্দ্র যে অমাবস্যার পর হইতে ক্রমশঃ বাড়িয়া পূর্ণিমার পর আবার হ্রাস পাইতে থাকে, এ নিয়ম কে করিয়া দিল?

আমাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদির, একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন এবং তিনিই উহাদের সম্বন্ধে নিয়ম স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, যে নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না।

তাঁহাকে ঈশ্বর বা জগতের কারণ বলা হয়।

এটা প্রমাণের যুগ, প্রমাণ না দিতে পারলে কেহ কোন কথা বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রমাণ সাধারণ-ভাবে দেওয়া যায় না। যাঁহারা তপস্যা করিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎ-কার পাইয়াছেন, তাঁহাদের বাক্য এবং কার্য্যই প্রমাণ।

তোমরা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পুস্তকে রোগের বীজাণু ও কীটাণুর বিষয় পড়িয়াছ। উহা চোখে দেখা যায় না এবং যতদিন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় নাই, ততদিন উহাদের অস্তিত্ব কেহ জানিত না। রাত্রে যে সকল নক্ষত্র নভোমণ্ডলে আমরা দেখিতে পাই, তদ্ভিন্ন আরও অনেক নক্ষত্র আছে। ঐ সকল নক্ষত্রের মধ্যে প্লুটো, নেপচুন বা বরুণ, ইউরেনাস্ প্রভৃতি গ্রহ চক্ষুগোচর হয় না। দৃশ্যমান গ্রহগুলির গতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া ঐরূপ অদৃশ্য গ্রহ থাকা অনুমিত হয়, পরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধিত হইলে, ঐ সকল গ্রহ দেখা যায়।

সেইরূপ ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য দেখিয়া তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা প্রমাণ পাই। ঈশ্বর চক্ষুগোচর নহেন, দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে তাঁহাকে দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, তাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্য-দৃষ্টির প্রয়োজন।

যাঁহারা তপস্যা করিয়া দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই এ সম্বন্ধে প্রমাণ।

পুরাণে দুইজন শিশু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন লেখা আছে। ঐ দুইজনের কথা তোমাদিগকে বলিব।

কদাচ মনে করিও না যে, ঈশ্বরকে কখনও দেখা যায় না এবং তিনি নিজে কোন কাজ করেন না, বা তাঁহার অস্তিত্ব নাই।

ধ্রুব

এক সময় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই রাণী। দুই রাণীর মধ্যে রাজা এক রাণীকে বেশী ভালবাসিতেন। তাঁর নাম সুরুচি। তাঁহার গর্ভে রাজার যে ছেলে জন্মিয়াছিল, তাহার নাম উত্তম। রাজা সর্ব্বদাই এই উত্তমকে আদর করিতেন এবং কোলে বসাইয়া খেলা করিতেন। অন্য রাণীকে রাজা ভালবাসিতেন না, তাঁর নাম সুনীতি। তাঁহার গর্ভেও রাজার এক ছেলে জন্মে, তাঁহার নাম ধ্রুব। ধ্রুব ও তাহার মা সুনীতি রাজ-বাটীর বাহিরে এক কুটীরে বাস করিতেন।

ধ্রুবর যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তিনি প্রায়ই রাজবাটীর ভিতর গিয়া খেলা করিতে চাহিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতেন; কিন্তু বিমাতার তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আসিতেন। একদিন ধ্রুব রাজবাটীতে গিয়া দেখেন তাঁহার পিতা ও বিমাতা রহিয়াছেন এবং বিমাতা সুরুচির পুত্র রাজার কোলে উঠিয়া খেলা

করিতেছে। ধ্রুবও তাই দেখিয়া রাজার কোলে উঠিতে গেলেন; তখন তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন যে, যাও, তুমি রাজার কোলে উঠিবার ভাগ্য লইয়া জন্মাও নাই, ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া আমার গর্ভে যদি জন্মিতে পারিতে, তাহা হইলে রাজার কোলে উঠিতে পারিতে।

ধ্রুব এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আপন মাতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং মাতাকে সমস্ত কথা বলিলেন। মাতাও তাঁহার কথা শুনিয়া নিজে কিছু করিতে পারিবেন না বুঝিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, তোমার বিমাতা ঠিকই বলিয়াছেন, ঈশ্বরের আরাধনা না করিলে তুমি তোমার বাপের কোলে উঠিতে পারিবে না বা বাপের রাজত্ব পাইবে না।

ধ্রুব তখন স্থির করিলেন যে, পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া বাপের সিংহাসনে বসিতে হইবে; এবং মাতার নিষেধ সত্ত্বেও, কোনও পূজা-অর্চ্চনার মন্ত্র বা বিধি না জানা থাকিলেও, পরমেশ্বরের আরাধনা করিবার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

ধ্রুব পথ চলিতে চলিতে নারদ ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নারদ তাঁহাকে চিনিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছেন? তখন ধ্রুব সমস্ত কথা নারদকে বলিলে, নারদ তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। ধ্রুব এই পরামর্শ না শুনিয়া

পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে স্থির সংকল্প প্রকাশ করিলে, নারদ তাঁহাকে মন্ত্র দিলেন।

ধ্রুব শিশু হইলেও, বিশ্বাসী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, এবং নারদের দত্ত মন্ত্র একমনে জপ করিতে থাকিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন, এবং তাঁহার নিকট বর লাভ করিয়া ইহজন্মে বাপের রাজত্ব ও পরজন্মে উৎকৃষ্ট স্থায়ী পরমপদ লাভ করিলেন।

ধ্রুব এখন ধ্রুবতারা হইয়া নক্ষত্র-লোকে আছেন এবং দেবতারা, ঋষিরা ও গ্রহ-নক্ষত্রগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

তোমরা উত্তর দিকে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে, ধ্রুবতারা দেখিতে পাইবে।

একমনে সাধনা করিলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়। ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করা যায়।

প্রহ্লাদ

তোমাদিগকে আর একটি ছোট ছেলে যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার গল্প বলিতেছি।

পুরাকালে যাহারা ঈশ্বর মানিত না, সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না, নিজেদের জীবন ও সুখ-দুঃখ ভগবানের কৃপাধীন স্বীকার করিত না, তাহাদিগকে অসুর, দৈত্য, ইত্যাদি নানা আখ্যা দেওয়া হইত।

হিরণ্যকশিপু নামে এক দৈত্য এক সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। সে নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করিত ও ঈশ্বর মানিত না।

হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম প্রহ্লাদ। ভগবানের কৃপায় অতি অল্প বয়সে প্রহ্লাদ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং ভগবদ্ভক্ত হন। প্রহ্লাদের পিতা তাহাকে দৈত্যবালকদের পাঠশালায় পড়িতে দেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, প্রহ্লাদ অন্যান্য দৈত্যবালকের ন্যায় তাঁহাকেই ঈশ্বর বা সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মানিবে।

প্রহ্লাদ পাঠ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলে, হিরণ্যকশিপু তাহাকে কি শিখিয়াছ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ, হরি-কথা শ্রবণ, তাঁহার অর্চ্চন ও তাঁহাতে আত্মসমর্পন—ইহাই উৎকৃষ্ট অধ্যয়ন বলিয়া মনে হয়।

হিরণ্যকশিপু ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, প্রথম শিক্ষকদিগকে তিরস্কার করিলেন ; পরে যখন শুণিলেন যে, শিক্ষকেরা প্রহ্লাদকে ঐরূপ শিক্ষা দেন নাই, তখন তিনি প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন।

হিরণ্যকশিপুর অনুচরগণ তাঁহার আদেশমত প্রথমে শূল দ্বারা প্রহ্লাদকে বধ করিবার চেষ্টা করিল, পরে তাঁহাকে হস্তীর পদতলে ফেলিয়া দিল, পরে কূপে ফেলিয়া দিল, তাঁহার খাদ্যের সহিত বিষ দিল, তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিল, উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিল—কিন্তু

প্রহ্লাদ একমনে ভগবানকে আত্মসমর্পণ করায় তিনি কোন উপায়েই মরিলেন না।

ইহাতে হিরণ্যকশিপু ভীত হইয়া কিছু দিন আর প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করিলেন না, কিন্তু প্রহ্লাদ তাঁহার সমবয়স্ক সমস্ত দৈত্যবালকগণকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিতে লাগিলেন ও তাহাদের আসুরিক ভাব ক্রমশঃ নষ্ট হইল।

হিরণ্যকশিপু ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য তাহাকে রাজসভায় ডাকাইলেন ও বলিলেন, তোকে এখনই আমি কাটিয়া ফেলিব। জানিস না যে, আমি ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোকের অধিপতিগণও ভয়ে কম্পিত হন; তোর কি শক্তি আছে যে তুই আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিস? প্রহ্লাদ বলিলেন, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানই আমার বল, কেবল আমার কেন, আপনার ও অন্যান্য বলবানদিগেরও বল। তিনি নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন এবং সংহার করিতেছেন।

হিরণ্যকশিপু ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুই যে বলিতেছিস আমা ভিন্ন আর একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি কোথায় থাকেন? প্রহ্লাদ বলিলেন, ভগবান সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন।

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, তিনি যদি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তবে সভার এই স্তম্ভে কেন নাই? প্রহ্লাদ

ভগবানের স্তব করিলে, তাঁহাকে স্তম্ভের মধ্যে দেখিতে পাইলেন, ও পিতাকে বলিলেন, ঐ দেখুন, তিনি স্তম্ভের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। হিরণ্যকশিপুর মন পবিত্র না হওয়ায় তিনি ভগবানকে দেখিতে পাইলেন না, এবং বলিলেন—তুই আমাকে ছলনা করিতেছিস, তোকে কাটিয়া ফেলিব। তিনি প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া স্তম্ভে মুষ্টি প্রহার করিলেন।

তাহাতে বিষম শব্দ করিয়া স্তম্ভ ফাটিয়া গেল, এবং স্তম্ভের মধ্য হইতে ভগবান নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, হিরণ্যকশিপুর পেট নখ দিয়া চিরিয়া ফেলিয়া, তাহাকে বধ করিলেন ও প্রহ্লাদকে অভয় দিলেন।

ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সকল বলবানের বল, সকল তেজস্বীর তেজ, তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না, সকলের জীবন তাঁহার অধীন এবং তিনি সর্ব্বত্র বিরাজ করেন।

বিশ্বাস

হিন্দুধর্ম্ম ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস শিক্ষা দেয়। চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আকাশ জল পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত ঈশ্বরের সৃষ্টি।

পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, আলোক-কণা সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। এইরূপ

দ্রুতবেগ মানুষের কল্পনার বাহিরে। মানুষের সৃষ্ট এরোপ্লেন, উড়ন্ত বোমা, কিছুরই এইরূপ গতি নাই। সমুদ্রে ঝড় উঠিলে তাহার কিরূপ ধ্বংস করিবার ক্ষমতা হয়, তাহা ১৩৪৯ সালের পূজার সময় মেদিনীপুরের ঝড়ে জানা গিয়াছে। সুমাত্রা দ্বীপে ক্রাকাটোয়া নামক আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া ঐ দ্বীপের কতকাংশ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে। এইরূপ ধ্বংস করিবার শক্তি আধুনিক আণবিক বোমারও নাই। মানুষের সৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার ক্ষমতা ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর ক্ষমতার তুলনায় কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময়। কখনও তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবে না, ক্রমাগত দুঃখ পাইতে থাকিলেও তাঁহার উপর বিশ্বাস হারাইও না। দুঃখ কষ্ট যাহা পাও, জানিবে তাহা পূর্ব্ব জন্মের, বা এই জন্মের কর্ম্মফল। ঐ দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া তোমার কর্ম্মফল ক্ষয় হইবে; অথবা দুঃখকষ্ট ভোগের ভিতর দিয়া তোমার চরিত্রের এবং মনের উৎকর্য সাধিত হইবে, তুমি জগতের অন্য পাঁচজনের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি করিতে পারিবে, হয়ত এই উদ্দেশ্যেই ভগবান তোমাকে দুঃখ দিতেছেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ঘটনা ঘটে না, কোন কিছু হয় না। তাঁহার ইচ্ছায় কোটী কোটী প্রাণী জন্মিতেছে, বাড়িতেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সূর্য্য অপেক্ষা

বহুগুণ বৃহৎ নক্ষত্র নূতন সৃষ্টি হইতেছে ও লয় পাইতেছে। এই সমস্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইতেছে জানিবে। প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে এবং শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ মনে তাঁহার স্তব পাঠ করিবে।

স্তব ঃ— ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্।
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ননির্দ্দেশ্য
সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব,
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ।

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম,
স্তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপাং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধি-পোতং শরণং ব্রজামঃ॥

প্রার্থনা ঃ— অসতো মা সদ্ গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়।

প্রণাম ঃ— ওঁ নমস্তে পরম ব্রহ্মন্ নমস্তে পরমাত্মনে
নির্গুণায় নমস্তভ্যং সদ্রূপায় নমোনমঃ॥
যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বংভুবনমাবিবেশ
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

——

দ্বিতীয় পাঠ

ভগবানের অবতার

ভগবান বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য, দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিবার জন্য, সাধুদিগকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করার জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে ভগবতীও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রীরূপে, কখনও মানুষ কখনও মানবেতর জীবরূপে, কখনও মাতৃগর্ভ হইতে, কখনও অযোনিজ বা অযোনিজারূপে আবির্ভূত হন। পূর্ব্বেও অনেক অবতার হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে।

ভগবানের অবতারের মধ্যে নারায়ণের দশ অবতার প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন রুদ্রের অবতার আছে, দেবীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া অসুর বিনাশের কাহিনী শাস্ত্রে আছে।

শ্রীকৃষ্ণকে অবতার না বলিয়া স্বয়ং ভগবান বলা হয়। এখন তোমাদিগকে নারায়ণের দশ অবতারের কথা বলিব।

১। মৎস্য অবতার

সৃষ্টির প্রথমে ভগবানের নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মা সম্পূর্ণ বেদ হস্তে লইয়া আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন এবং স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী ও মনুষ্য সৃষ্টি করেন ও বেদ প্রচার করেন। জলপ্লাবন-কালে ব্রহ্মার হস্ত হইতে বেদ পড়িয়া গেলে, হয়গ্রীব নামক দৈত্য উহা অপহরণ করে। বেদ উদ্ধার করিবার জন্য এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য নারায়ণ মৎস্যরূপ ধারণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের আখ্যায়িকা এইরূপ। জলপ্লাবনের পূর্ব্বে তৎকালীন মনু স্নান করিতে থাকা কালে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য তাঁহার হস্তে উঠে। তিনি ঐ মৎস্যকে পুনরায় জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলে, মৎস্য তাঁহাকে বলিল, আমাকে জলে ফেলিবেন না, তাহা হইলে বড় মৎস্যরা আমাকে খাইয়া ফেলিবে। মনু ইহা শুনিয়া তাহাকে বাটিতে আনিয়া একটি কলসে রাখিলেন। কিছুকাল পরে ঐ মৎস্য এত বড় হইল যে, কলসে তাহার স্থান সংকুলান হইল না। তখন মৎস্য মনুকে ডাকিয়া বলিল যে, এখানে আমার স্থান হইতেছে না, আমাকে অন্য স্থানে রাখুন। মনু ঐ মৎস্যকে লইয়া একটি পুষ্করিণীতে রাখিলেন। কিছু সময় পরে ঐ মৎস্য এত বড় হইল যে, পুষ্করিণীতে

তাহার স্থান সংকুলান হইল না। তখন মনু ঐ মৎস্যকে লইয়া একটি বড় দীঘিতে রাখিলেন। অল্প সময় পরে ঐ মৎস্য এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, বড় দীঘিতেও তাহার স্থান হয় না। মনু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তখন মৎস্য বলিল যে, আমাকে লইয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া দিন। মনু তাহাই করিলেন। তখন মৎস্য তাঁহাকে বলিল যে, শীঘ্রই পৃথিবী জলে প্লাবিত হইয়া সৃষ্টিধ্বংস হইবে। আপনি একটি নৌকা প্রস্তুত করুন এবং জীব-জন্তুর প্রত্যেক জাতির দম্পতি, ওষধি, বৃক্ষাদি উহাতে স্থাপন করুন। পরে জলপ্লাবন আরম্ভ হইলে আপনি ঐ নৌকায় আরোহণ করিবেন। তখন আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইব। আপনি নৌকা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে আপনিও সৃষ্টি ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবেন।

মনু মৎস্যের পরামর্শ অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিলেন, এবং জলপ্লাবন আরম্ভ হইলে নিজে নৌকায় আরোহণ করিলেন। তখন মৎস্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ এবং তাহার মস্তকে স্বর্ণময় একটি শৃঙ্গ। মৎস্য বলিল, আমার শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করুন। মনু তাহাই করিলে মৎস্য ঐ নৌকা লইয়া জলের উপর ভাসাইয়া রাখিল, এবং প্লাবনের শেষে সুমেরু পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইলে তথায় নৌকা লইয়া গেল। মনু স্থাবর

জঙ্গম সকল বস্তু ও প্রাণী লইয়া তথায় অবতরণ করিলেন। এইরূপে সৃষ্টি রক্ষা পাইল। ঐ মৎস্য হয়গ্রীব দৈত্যকে বধ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন। এইরূপে ধর্ম্মও রক্ষা হইলে। যে মৎস্যের কথা বলিলাম, ইনিই মৎস্য অবতার।

২। কূর্ম্ম অবতার

পুরাকালে ঋষির শাপ-বশতঃ লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় রত্ন সমুদ্র গ্রাস করেন। তখন স্বর্গে দেবতাগণের, ও মর্ত্ত্যে মনুষ্যগণের, অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয় এবং দেবতাগণ ঐ সকল রত্ন ও লক্ষ্মীকে উদ্ধার করার জন্য সমুদ্র-মন্থন করিবার প্রস্তাব করেন। সমুদ্র-মন্থন করিবার জন্য মন্থনদণ্ড হইবার উপযুক্ত কিছু না পাইয়া, অবশেষে মন্দার পর্ব্বতকে নির্ব্বাচিত করা হয়, এবং মন্থনরজ্জু শেষ নাগকে করা হয়। সমুদ্র মন্দার পর্ব্বতের ভার, এবং ঘর্ষণ জনিত কষ্ট, সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া, নারায়ণ কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করতঃ আপন পৃষ্ঠে মন্দার পর্ব্বতকে ধারণ করিলে, দেবতা ও দৈত্যগণ একত্রে সমুদ্র-মন্থন করেন। ঐ মন্থনের ফলে চন্দ্র, ধন্বন্তরি, অমৃত, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, ও অন্যান্য রত্নাদি সমুদ্র হইতে উত্থিত হয় এবং দেবতারা তাহা লন। লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান। শিব এই সমুদ্র-মন্থনের বিষয় অবগত ছিলেন না। নারদ ঋষি

তাঁহাকে সংবাদ দিলে, তিনি আসিয়া সকলের বারণ সত্ত্বেও পুনরায় সমুদ্র মন্থন করেন ; তাহাতে বিষ এবং বাড়বানল উত্থিত হয়। ঐ বিষে ত্রিভুবন নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, শিব ঐ বিষ পান করেন ও উহা কণ্ঠে রাখেন। তাহাতে তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া যায়। তদবধি তাঁহার নাম নীলকণ্ঠ। মন্থন সময়ে মন্দার পর্ব্বতের ভার ও ঘর্ষণের কষ্ট সহ্য করিবার নিমিত্ত ভগবান কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হন।

৩। বরাহ অবতার

পুরাকালে পৃথিবী অসুরগণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া রসাতলে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া পুনঃ স্থাপিত করার জন্য এবং অত্যাচারী দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ যজ্ঞ বরাহরূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার দেহ বিশাল এবং দন্ত বৃহৎ। ঐ দন্তাঘাতে তিনি হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন এবং জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করেন।

৪। নৃসিংহ অবতার

পূর্ব্ব কথিত হিরণ্যাক্ষর হিরণ্যকশিপু নামে এক ভ্রাতা ছিল। দেবতা ও মানুষের হাতে মৃত্যু হইবে না, ব্রহ্মার নিকট এই বর লাভ করিয়া সে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য জয় করে, এবং

অত্যন্ত অত্যাচারী ও ভগবদ্বিদ্বেষী হইয়া উঠে। দৈবক্রমে তাহার প্রহ্লাদ নামে এক পুত্র জন্মে; ইহার কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি; প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান নৃসিংহ মূর্ত্তি গ্রহণ করতঃ হিরণ্যকশিপুকে দুই হাতে ধরিয়া নখ দিয়া তাহার পেট চিরিয়া ফেলিয়া তাহাকে বধ করেন। অত্যাচারী দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করার নিমিত্ত ভগবান অর্দ্ধ-মনুষ্য অর্দ্ধ-সিংহ নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করেন।

৫। বামন অবতার

কশ্যপ প্রজাপতির দিতি ও অদিতি নামে দুই স্ত্রী ছিলেন। দিতির গর্ভে দৈত্যরা জন্মিয়াছিল এবং অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ জন্মিয়াছিলেন। দৈত্যগণের সহিত আদিত্য বা দেবতাগণের বিরোধ হয় এবং দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্রের পরাজয় হয় ও স্বর্গ হইতে ইন্দ্র বিতাড়িত হন।

ইন্দ্রকে স্বর্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেবতারা নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে, নারায়ণ অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

তখন বিরোচনের পুত্র বলি দৈত্যদের রাজা ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক, দাতা ও সত্যবাদী ছিলেন।

বলি রাজা যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন। এক সময় যজ্ঞ শেষে বলিরাজা দান করিতেছেন, এমন সময়

বামন ব্রাহ্মণ বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। বলিরাজা তাঁহাকে সমাদর করিয়া, তিনি কি প্রার্থনা করেন জিজ্ঞাসা করিলে বামন বলিলেন, তিনি ত্রিপাদ মাত্র ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি বলিলেন, আপনি বালক, অন্য কিছু প্রার্থনা করুন, ত্রিপাদ ভূমিতে কি হইবে? আপনি কোন গ্রাম বা জনপদ লইতে ইচ্ছা করিলে, আমি তাহা আপনাকে দিব। বামন বলিলেন, না আমি ত্রিপাদ ভূমিই লইব। তখন বলি আচমন ও সংকল্প করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনা মত ত্রিপাদ ভূমিই দিতে মনস্থ করিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই অবসরে তথায় আসিয়া ভগবানকে চিনিতে পারিয়া বলিকে ঐরূপ দান করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বলি তাহাতে নিরস্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমি দান করিব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি এবং ভগবান স্বয়ং আসিয়া আমার সমস্ত রাজ্য লইলেও আমি তাহা তাঁহাকে দিব। বামনদেব ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আচ্ছাদন করিলেন।

তখন বলি নিজের জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বামন দেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একশত জন মূর্খ লইয়া স্বর্গে বাস করিতে ইচ্ছা কর, না পাঁচ জন পণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস করিতে চাও"? বলি পাঁচ জন পণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস করিতে ইচ্ছা করিলে, বামন দেব তাঁহাকে বন্ধন করিয়া পাতালে প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে স্বর্গরাজ্য দৈত্যদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বামন দেব উহা ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

বলিকে ছলনা করিয়া, দৈত্যদের হস্ত হইতে স্বর্গ উদ্ধার করিয়া, দেবতাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগবান বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৬। পরশুরাম অবতার

ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিবার পর মনুষ্য সৃষ্টি করেন। প্রথমে সকল মনুষ্য একবর্ণ ছিল, পরে যখন মানুষ নগর ও গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের গুণ ও কর্ম্ম অনুযায়ী তাহারা চারিবর্ণে বিভক্ত হয়। এক শ্রেণীর লোক অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সমস্ত বুদ্ধি ও বিদ্যা ইহাদের অধিগত ছিল, এবং পুরুষানুক্রমে তাঁহারা সেই কার্য্য করিতেন। ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিত।

অপর এক শ্রেণী যুদ্ধ, বিগ্রহ, শাসন, প্রজাপালন, দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহারা শারীরিক বলে বলীয়ান ও যুদ্ধ-কৌশলী ছিলেন ইঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিত।

অপর এক শ্রেণী কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাদিগকে বৈশ্য বলিত।

অপর এক শ্রেণী নিজেরা কোন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া

অন্য তিন শ্রেণীর সেবা, বা চাকুরী করিতেন, ইহাদিগকে শূদ্র বলিত।

কালক্রমে ক্ষত্রিয়েরা অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। ইহাদের অত্যাচার দমন জন্য ভগবান পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হন।

পরশুরামের পিতা জমদগ্নি ঋষি। পরশুরাম তপস্যা করিয়া শিবের নিকট দিব্য অস্ত্র এবং ধনুর্ব্বিদ্যা লাভ করেন। তাঁহার পিতা ক্ষত্রিয়ের হস্তে নিহত হইলে, তিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবেন বলিয়া শপথ করেন এবং একুশ বার ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করেন। তৎকালীন প্রবল ক্ষত্রিয় সম্রাট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরশুরামের সহিত সংগ্রামে নিহত হন।

এইরূপে অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দিগকে দমন করিয়া পরশুরাম নিরস্ত হন।

৭। শ্রীরামচন্দ্র অবতার

তোমরা সকলেই রামায়ণ পড়িয়াছ আশা করি। না পড়িয়া থাক, বাটীতে গিয়া পিতা বা মাতার নিকট চাহিয়া রামায়ণ পড়িও বা রামায়ণের গল্প শুনিও।

রামারণ বাল্মীকি মুনির রচিত, এবং পৃথিবীর মধ্যে বহু পুরাতন কাব্যগ্রন্থ। সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে শ্যাম, ইন্দোচীন, মলয়, যবদ্বীপ, সুবর্ণ দ্বীপ (সুমাত্রা)

প্রভৃতি স্থানে ইহার বহুল প্রচার ছিল, এবং সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে ইহা অভিনীত হইত। রামায়ণের ঘটনাবলী ভারতে, ও ভারতের বাহিরে বহুস্থানে প্রস্তরে খোদিত হইয়া রামায়ণের লোকপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা আমাদের নিজের সাহিত্য ও কাব্যের অমূল্য সম্পদ।

আর্য্য ও অনার্য্যদের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া বিরোধ চলিতে থাকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণে লঙ্কা দ্বীপে রাবণ নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী অনার্য্য রাক্ষস রাজা ছিলেন। তিনি পৃথিবী জয় করেন এবং দেবতাদিগকে পরাভূত করেন। তাঁহাকে বধ করিয়া ধর্ম্ম, এবং আর্য্য সভ্যতা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার জন্য, ভগবান অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হন। লক্ষ্মীদেবীও মিথিলার রাজা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্ জনকের গৃহে সীতা রূপে আশ্রয় লন। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করেন। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বেই পিতৃসত্য পালন জন্য বনে গমন করেন। তথা হইতে রাবণ রাজা সীতাকে কৌশলে অপহরণ করিলে, শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণাবর্ত্তের বানর সেনানীর সহায়ে লঙ্কা অবরোধ করিয়া রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করেন ও অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি এমন সুনিয়মে প্রজা পালন ও প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন যে, এখনও সুশাসনকে রামরাজত্ব বলিয়া অভিহিত করা হয়।

৮। বলরাম অবতার

সৃষ্টির প্রথমে সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। মানুষ ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী ছিল। কালক্রমে ধর্ম্মের মর্য্যাদা হানি হইতে লাগিল ও লোকে সত্যভ্রষ্ট হইল। এইরূপে দ্বাপরের শেষভাগে মানুষ আপন সুবিধার জন্য অধর্ম্ম ও মিথ্যার আশ্রয় লইতে লাগিল। দৈত্যদের, অধার্ম্মিকদের এবং মিথ্যাচারীদের প্রতাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় অধার্ম্মিক ও মিথ্যাচারীদিগের উচ্ছেদ ও দৈত্য-নিধন জন্য দেবতাগণ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই সময় যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং বলরাম ভগবানের অংশ অনন্ত দেবের অবতার।

বলরাম প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। গদাযুদ্ধে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন ইঁহার শিষ্য ছিলেন। ইঁহার অপর নাম হলায়ুধ। কারণ তিনি হল বা লাঙ্গল অস্ত্র স্বরূপে ব্যবহার করিতেন এবং লাঙ্গল স্কন্ধে ভ্রমণ করিতেন।

আমাদের দেশের মহাকাব্য এবং ইতিহাস, মহাভারতের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ এবং তাহার গল্প জান। যদি না জানা থাকে, পিতামাতার নিকট এই মহাভারতের গল্প শুনিবে। ব্যাসদেব মহাভারতের রচয়িতা। পৃথিবীর মধ্যে এই গ্রন্থের তুল্য আর কোনও পুস্তক বা রচনা নাই।

জগতের সমস্ত সভ্য দেশের ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। বড় হইয়া তোমরা নিজেরাই মহাভারত পড়িবে এবং আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস অবগত হইবে। প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবত-গীতা এই মহাভারতের এক অধ্যায় মাত্র।

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিকথা এই মহাভারতে এবং অন্য পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ আছে।

তাঁহারা উভয়ে দৈত্য নিধন করিয়া এবং অধর্ম্মপরায়ণ মিথ্যাচারীদিগকে বিনাশ করিয়া, পুনরায় ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন।

৯। বুদ্ধ অবতার

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দ্বাপর যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার পর কলিযুগ আরম্ভ হয়। কলিযুগে লোকে স্বেচ্ছাচারী এবং ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতে থাকে।

এই সময়ে কপিলাবস্তুতে রাণী মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যের ভাবী অধিকারী ছিলেন। কিন্তু যুবা বয়সেই মানুষের দুঃখকষ্ট দেখিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাহাদের দুঃখকষ্ট কিসে দূর হইতে পারে, তাহার জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে ও পরে বুদ্ধগয়াতে অক্ষয় বটের নিম্নে তপস্যা করেন। তিনি বুদ্ধগয়াতে সিদ্ধি লাভ করেন এবং জ্ঞান লাভ

করিয়া বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। ৬কাশীধামে সারনাথে (যে স্থানে এখন মূলগন্ধ কুটি বিহার স্থাপিত আছে) নিজ ধর্ম্ম প্রাপ্ত করিতে আরম্ভ করেন।

তিনি প্রচার করেন, মানুষ নিজের কৃত কার্য্যের ফল স্বরূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করে এবং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। তিনি সদাচরণ ও সৎকার্য্য করিবার উপদেশ দেন ও কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইবে, জগতে প্রচার করেন। তাঁহার প্রচারিত অষ্টবিধ পন্থা জগৎ-প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সমাদৃত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে সম্রাট অশোকের সমস্ত এশিয়াখণ্ডে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। পরে খৃষ্টীয় ৮ম শতকে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য তৎকালীন বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধমতাবলম্বী।

ভারতের বৌদ্ধযুগ এক গৌরবময় যুগ। ভগবান গৌতম বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হইয়া এই যুগের সূচনা করেন।

পৃথিবীর সভ্য জাতিগণের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, বৌদ্ধ দর্শনের এবং মতবাদের নিকট কত ঋণী, তাহা তোমরা পরে পুস্তকাদি পড়িয়া বুঝিতে পারিবে।

১০। কলকী অবতার

যখন প্রবল কলিবশতঃ পুত্র পিতাকে, স্ত্রী স্বামীকে বালকগণ গুরুজনকে মানিবে না, যখন মানুষ অধর্ম্মাচারী

হইয়া মিথ্যা আশ্রয় করিয়া উন্নতি করিয়া গর্ব্ব করিবে, এবং ধর্ম্মের নিন্দা করিবে, এবং ধর্ম্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইবে, তখন ভগবান কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মাচারীদিগকে সংহার করতঃ ধর্ম্ম ও সত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তখন পুনরায় সত্য যুগ আরম্ভ হইবে।

এখনও কল্কী অবতার হয় নাই।

কল্কীই ভগবানের দশম অবতার।

তোমাদিগকে ভগবান বিষ্ণুর অবতারের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন ভগবান শঙ্কর বা রুদ্রের অবতার আছেন।

দেবীও ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

শিব-পুরাণ ও দেবী-পুরাণে তোমরা সে সকল বিষয় অবগত হইবে।

— —

দশাবতার স্তোত্র

প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃত-মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণী-ধরণ-কিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-কচ্ছপরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি-কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদ-নখ-নীর-জনিত-জনপাবন
কেশব ধৃত-বামনরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপং
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি-কমনীয়ং
দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃত-রঘুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

বহসি বপুষি-বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্।
কেশব ধৃত-হলধররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥

নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতি-জাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদারাং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃত-দশবিধরূপ
জয় জগদীশ হরে॥
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি-বহতে ভূগোলমুদ্ বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তেকারুণ্যমাতন্বতে
মেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

তৃতীয় পাঠ

হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ

বেদ হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদ চারিটি—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব।

ঋক্ দেবতাগণের স্তুতিবাচক। ঋক্গুলির সমষ্টিকে ঋক্বেদ কহে।

যজুর্ব্বেদে বিভিন্ন যজ্ঞের নিয়মাবলী ও মন্ত্র আছে।

সামবেদে যে সকল বৈদিক মন্ত্র গান করা হয় তাহা আছে।

অথর্ব্ববেদে শত্রু বিনাশ, পীড়া ও হিংসক জন্তু প্রভৃতি দুর্দ্দৈব হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যে সকল যজ্ঞ করা

হইত, বা ক্রিয়াদি করা হইত, তাহার মন্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যার ক্রিয়াপদ্ধতি ইহাতে আছে।

আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্র অথর্ব্ববেদ হইতে উৎপন্ন।

ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। সকল বেদই গুরু-শিষ্যানুক্রমে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত। পরে বিভিন্ন অবস্থায়ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কিছু কিছু পাঠ ভেদ হইয়াছে। অধুনা ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।

বেদান্ত—বেদের এক অংশকে আরণ্যক বলে। আরণ্যকের এক অংশ উপনিষৎ। ইহাকে বেদন্তে বলে। উপনিষৎগুলি জগতের মনীষার শ্রেষ্ঠরত্ন। ব্রহ্মবিদ্যা ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

বেদাঙ্গ—ছয়টী

১। শিক্ষাসূত্র—ইহাতে বর্ণের উচ্চারণ ইত্যাদি আছে।

২। কল্পসূত্র—ইহাতে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানপদ্ধতি আছে।

৩। ব্যাকরণ—ইহাতে পদসাধনাদির নিয়ম আছে।

৪। নিরুক্ত—ইহাতে বৈদিক শব্দের যোগার্থ নিরুপিত হইয়াছে।

৫। ছন্দ।

৬। জ্যোতিষ—ইহাতে গ্রহনক্ষত্রের রূপ ও গতির বিষয় লিখিত আছে।

তন্ত্র—শাক্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ। বহু তন্ত্র আছে;

তন্মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহাতে নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা এবং দেবদেবীগণের পূজা, হোম ইত্যাদির বিষয় এবং মন্ত্র, বীজমন্ত্র প্রভৃতি লিখিত আছে। বাংলাদেশে ইহার বহুল প্রচার আছে।

রামায়ণ, মহাভারত, এই দুইটী মহাকাব্য ইতিহাস এবং ধর্ম্মগ্রন্থও বটে।

অষ্টাদশ পুরাণ—১। ব্রহ্ম পুরাণ ২। পদ্ম পুরাণ ৩। বিষ্ণু পুরাণ ৪। বায়ু পুরাণ ৫। ভাগবত ৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭। অগ্নি পুরাণ ৮। ভবিষ্য পুরাণ ৯। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ১০। লিঙ্গ পুরাণ ১১। বরাহ পুরাণ ১২। স্কন্দ পুরাণ ১৩। বামন পুরাণ ১৪। কূর্ম্ম পুরাণ ১৫। মৎস্য পুরাণ ১৬। গরুড় পুরাণ ১৭। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ১৮। নারদীয় পুরাণ। এতদ্ভিন্ন শৈব ও শাক্ত আরও অনেক পুরাণ আছে।

স্মৃতি—২০টী সংহিতা আছে, তন্মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বপ্রধান ও প্রামাণ্য। ইহাতে ব্যবহার (আইন), ধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও জীবন যাপনের নিয়মাবলী বর্ণিত আছে।

১। মনু ২। অত্রি ৩। বিষ্ণু ৪। হারিত ৫। যাজ্ঞবল্ক্য ৬। উশনা ৭। অঙ্গিরা ৮। যম ৯। আপস্তম্ব ১০। সম্বর্ত্ত ১১। কাত্যায়ণ ১২। বৃহস্পতি ১৩। পরাশর ১৪। ব্যাস ১৫। শঙ্খ ১৬। লিখিত

১৭। দক্ষ ১৮। গৌতম ১৯। শাতাতপ ২০। বশিষ্ঠ। —এই ২০টী সংহিতা।

বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তমাল।

দর্শন—১। বেদান্ত দর্শন—প্রণেতা—বেদব্যাস। ২। সাংখ্য দর্শন—প্রণেতা—মহর্ষি কপিল। ৩। পাতঞ্জল দর্শন—প্রণেতা—মহর্ষি পতঞ্জলি। ৪। ন্যায় দর্শন—প্রণেতা—অক্ষপাদ গৌতম। ৫। বৈশেষিক দর্শন—প্রণেতা—কণাদউলুক ৬। মীমাংসা দর্শন—প্রণেতা—মহর্ষি জৈমিনি, এই ছয়টী প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন চার্ব্বাক দর্শন আছে, তাহা নাস্তিক দর্শন বলিয়া আদৃত নহে।

যোগশাস্ত্র ঃ—হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি। যোগের বিধি ও নিয়ম ইহাতে আছে।

চতুর্থ পাঠ

যুগবিভাগ

হিন্দুরা প্রধানতঃ চারিযুগ মানিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্য্যন্ত হইতে থাকিবে।

সত্যযুগের	পরিমাণ	১৭২৮০০০	বৎসর
ত্রেতাযুগের	”	১২৯৬০০০	”
দ্বাপরযুগের	”	৮৬৪০০০	”
কলিযুগের	”	৪৩২০০০	”

এইরূপ চারিযুগে বা মোট ৪৩২০০০০ বৎসরে দেবতাদের এক যুগ হয়।

১০০০ এক সহস্র দেবতাদের যুগে অর্থাৎ ৪৩২ কোটী বৎসরে এক কল্প হয়।

কল্পান্তে মহা প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে এবং সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া ভগবানে লয় প্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবীর বা বহ্মাণ্ডের আর অস্তিত্ব তখন থাকে না। পরে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে নূতন সৃষ্টি হয়।

পূর্ব্বে অনেক কল্প গিয়াছে, পরে অনেক কল্প হইবে। বর্ত্তমান কল্পের নাম শ্বেত-বরাহ কল্প।

প্রতি কল্পে ১৪ জন মনু বা ধর্ম্ম-বিধান-দাতা থাকেন। এক এক মনুর অধিকার কাল ৩০ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৪ শত ২৮ আঠাশ বৎসর ৭ মাসের কিছু কম। বর্ত্তমান কল্পে ৬ জন মনুর অধিকার গত হইয়া ৭ম মনুর অধিকার চলিতেছে। ইঁহার নাম বৈবস্বত মনু।

মন্বন্তর ঃ—এক মনু হইতে অন্য মনু পর্য্যন্ত সময়কে মন্বন্তর বলে। প্রথম মনু ব্রহ্মার মানস-পুত্র ছিলেন, ঐ মন্বন্তরকে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর বলিত। বর্ত্তমানে বিবস্বানের পুত্র মনু, নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। মনু ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা।

মনুগণের নাম ঃ—১। স্বায়ম্ভুব ২। স্বারোচিষ ৩। উত্তম ৪। তামস ৫। রৈতর ৬। চাক্ষুষ ৭। বৈবস্বত ৮। সাবর্ণি ৯। দক্ষ সাবর্ণি ১০। ব্রহ্ম সাবর্ণি ১১। ধর্ম্ম সাবর্ণি ১২। রুদ্র সাবর্ণি ১৩। র‍্যোচ্য ১৪। ভৌত্য।

যুগধর্ম্ম

সত্যযুগ ঃ—এই যুগে মিথ্যা ও পাপ ছিল না। ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল। মানুষ বৃহদাকার ও ইচ্ছা-মৃত্যু ছিল।

ত্রেতা যুগে মিথ্যা ও পাপ সমাজে প্রবেশ করিলে ধর্ম্ম ত্রিপাদ হইলেন, মানুষের আয়ু ও আকার কমিয়া গেল।

দ্বাপর যুগে মিথ্যা ও পাপের বৃদ্ধি হয় এবং ধর্ম্ম দ্বিপাদ ও মানুষের আয়ু এবং আকার আরও কমিয়া যায়।

কলিযুগে মিথ্যা ও পাপের প্রাবল্য ; ধর্ম্ম একপাদ, এবং ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে আজ হইতে অনুমান ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগ আরম্ভ। মানুষ অল্পায়ু ও আকারে ছোট হইয়াছে ; দেবতারা এক্ষণে আর মর্ত্ত্যে আসেন না। ধর্ম্ম লোপ হইবার সম্ভাবনা হইলে কলিশেষে, কল্কী অবতার হইয়া পুনঃ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন, ও সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে। এইরূপ চারি যুগ সহস্রবার আবর্ত্তিত হইলে ব্রহ্মার এক দিন হইবে। ব্রাহ্মী দিনের শেষে প্রলয় হয় এবং সমস্ত জগৎ আপন কারণ পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়।

——

পঞ্চম পাঠ

সৃষ্টি

সৃষ্টি—ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ব্রহ্মার উৎপত্তি। তিনি সংবৎসর, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পরে স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করেন। নব্য বিজ্ঞান মতে প্রাণীর প্রথম উৎপত্তি জলে। পরে উভচর প্রাণীর উৎপত্তি, পরে ভূচর প্রাণীর উৎপত্তি। ভূচর প্রাণীর ক্রমবিবর্ত্তন, বন-মানুষ, গরিলা ইত্যাদি। পরে মানুষের উৎপত্তি।

আমাদের হিন্দু মতে প্রধান অবতার মৎস্য—জলচর।

দ্বিতীয় অবতার কূর্ম্ম—উভচর।

তৃতীয় অবতার বরাহ—ভূচর।

চতুর্থ অবতার নৃসিংহ—মনুষ্য এবং পশু উভয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট।

পঞ্চম অবতার বামন—খর্ব্বাকৃতি মনুষ্য।

ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম—অরণ্যবাসের উপযোগী কুঠারধারী।

সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র—ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ ও স্থায়ী রাজ্য স্থাপনকারী।

অষ্টম অবতার বলরাম—হলায়ুধ কৃষির প্রতীক লাঙ্গলধারী।

নবম অবতার বুদ্ধ—তৎকালীন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

ইঁহাদের মধ্যেও ক্রমবিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

দশম অবতার কল্কী—সমস্ত জগতের দুর্ব্বৃত্তদিগকে ধ্বংস করিয়া ধর্ম্ম ও একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপন করিবেন।

আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক মত আছে।

মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে যে সৃষ্টি-প্রকরণ কথিত হইয়াছে, তাহা এইঃ—ভগবান প্রথমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করিয়া জলমধ্যে শয়ান ছিলেন। তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তাঁহার অপর নাম স্বয়ম্ভু। এই ব্রহ্মা পরিদৃশ্যমান জগতের

সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ভগবান সূর্য্যকে এবং দিনরাত্রি, সংবৎসর, কাল, ঋতু, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করেন। ভূতসৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি আকাশ, ইহার গুণ শব্দ; আকাশ হইতে বায়ু—ইহার গুণ স্পর্শ; বায়ু হইতে অগ্নি, ইহার গুণ রূপ; অগ্নি হইতে জল, ইহার গুণ রস; জল হইতে পৃথিবী, ইহার গুণ গন্ধ। যখন প্রলয় হইবে, তখন পৃথিবী জলে লয় হইবে; জল অগ্নিতে লয় হইবে; অগ্নি বায়ুতে লয় হইবে; বায়ু আকাশে লয় হইবে এবং আকাশ অব্যক্তে লয় হইবে।

ব্রহ্মা মনন করা মাত্র তাঁহার পুত্র জন্মে; মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু প্রভৃতি তাঁহার মানসপুত্র। দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। মরিচীর পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির ১৩ জন কন্যাকে বিবাহ করেন।

কশ্যপের পুত্র বিবস্বান, বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর বংশ মনুষ্যগণ। কশ্যপের অন্য পত্নীগণের গর্ভে দেবতা, দৈত্য, সর্প, পক্ষী প্রভৃতি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণী সকল জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি হয়।

দেবতা, অসুর ও মানুষের শারীরিক ও মানসিক গুণের পার্থক্যবশতঃ ইহাদের মধ্যে আদর্শ ও কার্য্যের প্রভেদ হইয়াছে। দেবাসুরের বিরোধ পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

দেবতাগণ আপন প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয় দমন করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিয়া আছেন; তাঁহাদিগকে সত্ত্বগুণ-প্রধান বলা যায়।

অসুরগণ প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয় দমন করে নাই, তাহারা ক্রূরকর্ম্মা, উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব; তাহাদিগকে তমোগুণ-প্রধান বলা যায়।

রজোগুণবশতঃ প্রাণী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সত্ত্বগুণে বিষয়ে আসক্তি নিবৃত্ত হয়, মন শান্ত হয়; তমোগুণে বুদ্ধি মোহযুক্ত হয়, লোকে আপন শ্রেয়াশ্রেয়ঃ বুঝিতে পারে না, এবং কুকর্ম্ম করিয়া থাকে।

মানুষে এই তিন গুণই অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে।

হিন্দু ধর্ম্মানুসারে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ব্রহ্ম বা ভগবান। সর্ব্বভূতে চেতনা আছে। জীবজন্তু কীট পতঙ্গে চেতনা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের চেতনা স্বীকার করিতেন না। বাঙ্গালী বিজ্ঞানবিৎ স্যার জগদীশচন্দ্র বসু যন্ত্র সাহায্যে উদ্ভিদের চেতনা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ধাতু পাথর ইত্যাদির চেতনা তমসাবৃত, বুঝিবার উপায় নাই। যোগীরা বুঝিতে পারেন। চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান হইতে উদ্ভূত কোন বস্তু অচেতন হইতে পারে না।

——

ষষ্ঠ পাঠ

দেবাসুর যুদ্ধ

ক্ষণস্থায়ী এবং জন্মমৃত্যু - সুখদুঃখের অধীন নিজ দেহকেই আত্মা মনে করিয়া, ঐ দেহের তৃপ্তি এবং পুষ্টি সাধনকে পরমার্থ মনে করা আসুরিক আদর্শ।

দেহাতিরিক্ত অবিনশ্বর আত্মা আছেন, তিনি সর্ব্বগত এবং সুখদুঃখের অধীন নহেন। সুখ দুঃখ ক্লেশ রোগ শোক প্রভৃতি দেহের ধর্ম্ম মাত্র। সর্ব্বভূতে সমদর্শন, দয়া এবং আত্মজ্ঞানই পুরষার্থ, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৈব আদর্শ।

আদর্শগত প্রভেদজন্য, এবং জগতে প্রভুত্ব লাভের জন্য দেব-দানবের বিরোধ ও সুর-অসুরের যুদ্ধ হয়।

প্রথম বিষ্ণু ও মধুকৈটভের যুদ্ধ পরে অন্যান্য যুদ্ধ। তোমরা বড় হইয়া পুরাণে ও ইতিহাসে এই সকল যুদ্ধের বিষয় জানিতে পারিবে। দেবতাদের অসুরদের নিকট পরাজয় হয়, পরে সকল দেবতা একত্রিত হইয়া কোনও সময় বিষ্ণুকে কোনও সময় শিবকে, কোনও সময় দুর্গাকে বা চণ্ডিকাকে অর্চ্চনা করিয়া অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এবং অসুরদের পরাজয় ঘটে। দেবগণের সমবেত তেজ হইতে চণ্ডিকা উদ্ভূত হন, এবং মূর্ত্তিমতী সংহতি-শক্তির নিকট দানব-শক্তির পরাভব হয়। দেবীপূজা প্রকৃতপক্ষে সংহতি-

শক্তির আরাধনা। তোমরা যদি পরস্পরের মধ্যে ভেদ ভুলিয়া গিয়া, এক হইয়া, একজনকে নায়ক করিয়া, একমতে কাজ কর, কোনও বিরুদ্ধ শক্তি তোমাদের নিকট দাঁড়াইতে পারিবে না, বা তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। তোমরা সর্ব্বত্র জয়লাভ করিবে। নিজেদের মধ্যে বিরোধ না করিয়া, একমত হইয়া, সাধারণের শত্রু দমন করিতে শিখ। মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ৮১ অধ্যায়ে উপদেশ আদেশ যে ভেদ উপস্থিত হইলে এক কালে সকলের বিনাশ হয়। সর্ব্বদা স্বপক্ষের উন্নতি সাধন করিলে, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়। ১০৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে—আত্মীয়-ভেদ শত্রুভয় অপেক্ষাও গুরুতর। আত্মীয় ভেদ না হয়, এজন্য আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবে। কদাচ ভেদ-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিবে না।

——

সপ্তম পাঠ

দেবতা

দেবতা একই। তবে মানুষ অসীম এবং নিরাকার বা নির্গুণের ধারণা করিতে পারে না বলিয়া, ভগবানের এক এক গুণের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা করা হয়। এইরূপে বহু দেবতার উৎপত্তি।

ভগবান এক এক লীলায় যে মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার পূজা করা হয়। যে সকল ব্যক্তিতে ঐশ্বরিক শক্তির উল্লেখযোগ্য বিকাশ হইয়াছিল, যাঁহারা যুগ-প্রবর্ত্তক বা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক তাঁহাদেরও পূজা করা হয়। মনে রাখিতে হইবে—এই পূজা মৃত্তিকা প্রস্তর বা ধাতু-নির্ম্মিত মুর্ত্তির বা কোনও সৃষ্ট জীবের নহে। পূজা ভগবানের, সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী ভগবানের কল্পনা করা অসম্ভব; সেই জন্য তাঁহার বিভিন্ন লীলামুর্ত্তি মানুষ পূজা করিয়া থাকে, এবং সৃষ্টির প্রথম হইতে করিয়া আসিতেছে। ইহা ইট কাঠ পাথর প্রভৃতির পূজা নহে।

কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন, তাঁহারা একেশ্বরবাদী আর হিন্দুরা পুতুল-পূজক। ইহা সত্য নহে। এক ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হিন্দুরা পূজা করেন।

——

অষ্টম পাঠ

মন্দির

মন্দির বা পূজার স্থানে যাইতে হইলে, শুদ্ধ হইয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া হাত পা ধুইয়া ভক্তি-পূর্ণ মনে যাইবে।

পূজার স্থানই মন্দির। পবিত্র হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবে। তথায় হাসি-তামাসা করিবে না। দেবতাকে,

বা যাহারা পূজার্থ আসিয়াছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা বা অসম্মান করিবে না, তথায় পান সিগারেট খাইবে না। উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না। অন্যের মন বিক্ষিপ্ত হয়, এমন কোনও কার্য্য বা আচরণ করিবে না। ভক্তিভরে দেবতাকে প্রণাম ও দেবতার পূজা করিবে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা পরাধীন হইবার পর এবং হিন্দু রাজত্ব অবসানের পর হইতে আমাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্মস্থান, দেববিগ্রহের উপর বিধর্ম্মীরা অবাধে আক্রমণ চালাইয়াছে। আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার পরও আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণের হিন্দু ধর্ম্মের উপর অনাস্থা ও হিন্দু জনসাধারণের ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া বিধর্ম্মীরা ও হিন্দু নামধারী অহিন্দুরা ঐরূপ আক্রমণ চালাইতেছে। যদি আমরা ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইতাম, আমাদের ধর্ম্ম দেবতা ও মন্দিরের উপর অন্যে আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ নহি, সেজন্য দুর্ব্বল বলিয়াই আমাদের উপর অত্যাচার হয়। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ় হইলে, এবং দেবতার উপর ঐকান্তিক ভক্তি থাকিলে, ধর্ম্মের জন্য, দেবতার জন্য, প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত না হইলে, কেহই আমাদের ধর্ম্মের অবমাননা, দেবতা বা দেবস্থানের অবমাননা করিতে সাহসী হইত না।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখান যায় যে, হিন্দুর দেবতা ও শোভাযাত্রা যাহা তাহাদের ধর্ম্মের একাংশ বলিয়া প্রচলিত,

তাহার সম্বন্ধে কত বিধিনিষেধ; কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যাহারা আপনাদের ধর্ম্মে এবং আচার-ব্যবহারে দৃঢ় বিশ্বাসী, এবং উহাতে কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করে না, তাহাদের শোভাযাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ আরোপিত হয় না; হইলেও বলবৎ করা হয় না।

তোমাদের চারিদিকে চাহিয়া দেখ। প্রাণী-জগতে দুর্ব্বলকে প্রবল সংহার করতঃ আহার করিতেছে। মানুষের বেলায়ও ঐ একই নিয়ম খাটে। সকল মানুষ নরভুক্ নয় বটে, কিন্তু প্রবল দুর্ব্বলকে আপনার ভৃত্য বা ভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। বলবান দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, দুর্ব্বলের ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র, প্রবলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা দুঃসাধ্য।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে দুর্ব্বলকে প্রবলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব রাজার উপর ন্যস্ত ছিল। এক্ষণে হিন্দু রাজা নাই, সেই রাজনীতিও প্রচলিত নহে। এখানকার প্রচলিত দণ্ডবিধি আইন অনুসারে অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধীর দণ্ড হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্ব্বলের ও সহায়হীনের প্রমাণ সংগ্রহ সুকঠিন।

এখন বল সঞ্চয় করাই হিন্দুদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য। বল সঞ্চয়ের প্রধান উপাদান একতা। সকলের একত্র হওয়া ও একমত হওয়া ভিন্ন হিন্দুর বাঁচিবার উপায় নাই। তোমরা তোমাদের ধর্ম্মের, সমাজের, কৃষ্টির ও

আপনাদের রক্ষার জন্য নিজেদের শ্রেণীবিভেদ, নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ ভুলিয়া একত্রিত হইতে পারিলে, কেহই তোমাদের দেবস্থান বা ধর্ম্মব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না।

— —

নবম পাঠ

তপস্যা

সিদ্ধিলাভ করিবার ঐকান্তিক চেষ্টাকেই তপস্যা বলা যায়। একাগ্র মনে কোন দেবতার ধ্যান বা পূজা করিলে দেবতার দর্শন লাভ হয়।

সাধারণতঃ আমরা দেবদর্শন পাই না ; তাহার কারণ— আমাদের মনে অন্য চিন্তা আসে, মন একাগ্র হয় না। আমাদের ধর্ম্ম-পুস্তকসমূহে এইরূপ দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া ও তাঁহার নিকট বর লাভ করার অনেক কাহিনী লিখিত আছে ; উহা সম্পূর্ণ সত্য। ৺তারকেশ্বর ধামে ও অন্যত্র, এইরূপ একমনে দেবতাকে ডাকিয়া কত লোকে দেবতার নিকট ঔষধ পাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বহু দিন, বহু বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিতে হয়। আমাদের মন এমন যে, সর্ব্বদাই এক

বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লিপ্ত হইতেছে। অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ মনকে শান্ত করিয়া একাগ্র করা যায়। মনে যখন অন্য চিন্তা আসিবে না, তখন বুঝিবে মন একাগ্র হইয়াছে। মনকে এইরূপ অবস্থায় আনিতে পারিলে, যে কার্য্যে মন দিবে তাহাতে সফলকাম হইবে। যদি মন একাগ্র করিয়া অধ্যাপকের বা শিক্ষকের উপদেশ এবং পাঠ গ্রহণ কর, বা পুস্তক পাঠ কর, দেখিবে দুর্ব্বোধ্য বিষয়ও সহজবোধ্য হইয়াছে, এবং কোন পরীক্ষায় তোমরা অকৃতকার্য্য হইবে না। দেবতার আরাধনাই কর, কি লেখাপড়া কর, কি অন্য কোন বিষয়ে চেষ্টা কর, তপস্যায় ফললাভ হইবেই হইবে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, শরীর শোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। অহিংসা, অনৃশংসতা, সত্য ও দয়াই যথার্থ তপস্যা। অন্যত্র লেখা আছে, ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা উপবাস নহে।

——

দশম পাঠ

সত্য

আমাদের শাস্ত্রে, এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে, সত্যের মহিমা কীর্ত্তিত আছে।

সৎ-শব্দ-হইতে সত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সৎ

অর্থে যাহা আছে। সত্য চিরস্থায়ী, ইহার বিকল্প নাই ক্ষয় বা বিনাশ নাই।

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপঃ, সত্যই প্রজাসৃষ্টি ও প্রজা-পালন করিয়া থাকে। মিথ্যা—অহঙ্কার ও নরক, সত্য—আলোক ও স্বর্গ, ধর্ম্ম ও প্রকাশ। শান্তিপর্ব্ব ১৯০ অধ্যায়।

সত্য কথা বলা ও সত্য আচরণ করা সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। সত্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যদি তুমি সর্ব্বদা সত্য কথা বল এবং সত্য আচরণ কর, এবং বৃথা বাক্যব্যয় না কর, তোমার বাক্‌সিদ্ধি লাভ হইবে। সত্যই পরমেশ্বর। সত্যের উপাসক হইলে ভগবানের উপাসনাই করা হয়।

—

একাদশ পাঠ

অহিংসা

সাধারণতঃ অহিংসা বলিতে আমরা জীবহত্যা না করা বুঝি, কিন্তু হিন্দুর দর্শন অনুসারে সর্ব্বভূতেই চেতনা আছে, চেতনা থাকিলেই তাহাকে জীব বলা যায়। ফল মূল ধান্য ইত্যাদিও এই শ্রেণীর, সুতরাং জীবহত্যা ভিন্ন কোন জীব আত্মজীবন রক্ষা করিতে পারে না।

আহার করিতে হইলেই জীবহত্যা বা হিংসা করিতে হয়। আমাদের ধর্ম্মমত অনেক স্থলে প্রাণীহত্যা নিষেধ

করে। সেখানে প্রাণী বলিতে আমরা পশুপাখী ইত্যাদি বুঝি। আবার কোন কোন মত অনুসারে, বৃথা প্রাণবধ নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু পূজাদিতে বলিদান বা পশুবধ বিহিত আছে। এই লইয়া আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর সহিত অন্যের বিবাদ হয়। বস্তুতঃ, সূক্ষ্ম দর্শনানুসারে, যখন আমরা সকলেই জীবহিংসা ভিন্ন প্রাণ-ধারণ করিতে পারি না, তখন এই বিষয় লইয়া নিজেদের মধ্যে বিরোধ কর্ত্তব্য নহে।

বাঙ্গালী যাঁহারা মৎস্য খান, এবং দক্ষিণ ও অন্যান্য দেশবাসী যাঁহারা মৎস্য-মাংস খান না, তাঁহাদের মধ্যে আচার-ব্যবহারের পার্থক্য আছে। শাক্তের সহিত বৈষ্ণবের ধর্ম্মানুষ্ঠানে পার্থক্য আছে, অথচ সকলেই হিন্দু। এই কারণে পরস্পরের সহিত কখনও বিরোধ করা উচিত নহে। পরস্পরের আচার-ব্যবহারের উপর আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের শাস্ত্রে অহিংসার প্রশংসা আছে, সেখানে শাস্ত্রকারেরা মনের অবস্থা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, মনে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা পোষণ করিতে বারণ করা হইয়াছে।

একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাউক—যেখানে আত্মজীবন দান করিয়া কাহারও কোন উপকার করা যায় না, সেখানে আত্মজীবন রক্ষা করাই ধর্ম্ম। ডাকাতের দল বা শত্রু সশস্ত্র হইয়া হত্যা করিতে আসিতেছে,

সেখানে তাহাদের প্রতিরোধ করা, এবং আবশ্যক হইলে বিনাশ করাই ধর্ম্ম। ইহাতে অধর্ম্ম বা দোষ হয় না।

আমরা অহিংসা বলিয়া আমাদের কাপুরুষতা, ক্লীবত্ব ঢাকিয়া রাখিতে চাহি। মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে গেলে, শত্রুর ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবেই। আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেও হইবে। সেখানে অহিংসা মানে এই যে, শত্রুর বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া, যুদ্ধে নির্ম্মমভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবে। যখন শত্রুকে হত্যা করিতে হইবে, হত্যা করিবে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিও না। নিজেকে রক্ষা করিবার জন্যই হত্যা করিবে।

ভগবান বুদ্ধ অহিংসা ধর্ম্ম-প্রচারক। তাঁহাকে রাজ-সেনাপতি সিংহ, যুদ্ধ সম্বন্ধে, এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে হত্যা করা সম্বন্ধে, প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন যে, "সর্ব্ব-প্রকার সংগ্রাম শোচনীয়, কিন্তু বুদ্ধ এরূপ শিক্ষা দেন না যে, যাহারা শান্তিরক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার পর সাধু উদ্দেশ্যে সংগ্রামরত হয়, তাহারা নিন্দার্হ। বিরোধ থাকিবেই, কারণ সমস্ত প্রাণীজগৎ একটা সংগ্রাম বিশেষ। কিন্তু সংগ্রামকারীকে দেখিতে হইবে যে, তিনি যেন স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া সত্য ও সদাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন। যে শাস্তির যোগ্য, তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে।

বিচারক যখন শাস্তি বিধান করেন, তখন তাঁহার চিত্ত দ্বেষহীন হইবে। হত্যাকারক (ঘাতক) প্রাণবধ সময়ে চিন্তা করিবে যে, উহা তাহার (অপরাধীর) নিজের কৃত কর্ম্মের ফল।" (১) ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে, সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রাণবধ করা প্রয়োজন, ইহা স্বয়ং বুদ্ধদেবও বলিয়া গিয়াছেন।

দ্বাদশ পাঠ

ষড় রিপু

মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি বা স্বভাব আছে। ঐগুলির আতিশয্য নিন্দনীয়, এবং অসংযত প্রবৃত্তিকে রিপু বা শত্রু বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য,—এই ছয়টিকে রিপু বা শত্রু বলা হয়। প্রিয়-জনের সঙ্গ বা প্রিয়বস্তু সর্ব্বদা পাইবার ইচ্ছাকে কাম বলা যাইতে পারে। কামনা বাধা প্রাপ্ত হইলে, বা কেহ মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে, বা কোন ক্ষতিকর কার্য্য করিলে, বা কষ্ট দিলে, ঐরূপ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার যে প্রবৃত্তি হয় এবং মনে যে অশান্তি হয়, তাহাকেই ক্রোধ বলা হয়।

---

(১) ভিক্ষু শীলভদ্র প্রণীত বুদ্ধবাণী হইতে উদ্ধৃত।

অভিলষিত দ্রব্য যে কোন উপায়ে পাইবার আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলা হয়।

প্রকৃত জ্ঞান না থাকায় বা সাময়িকভাবে জ্ঞান আবরিত হওয়ায়, যখন বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকে, যখন সত্য নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না, তখন মোহ উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

ধন, বিদ্যা, পদ, প্রভুত্ব, ইত্যাদি প্রাপ্ত হইলে মনে যে অহঙ্কার বা গর্ব্ব হয়, তাহাকে মদ বলা যায়। এই অবস্থায় অন্যের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব আসে। অপরের ধন, বিদ্যা, পদ, প্রভুত্ব, ইত্যাদি দেখিয়া মনে যদি ক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং ঐরূপ ব্যক্তির ক্ষতি করিবার ও নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি আসে, তাহাকে মাৎসর্য্য বলে।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে, এই সকল রিপু দমন করিতে হইবে। অভ্যাস দ্বারা এই সকল রিপু আয়ত্তে আনিতে পারা যায়। মনে রাখিবে, তুমি যদি রিপু আয়ত্ত করিতে না পার, রিপু তোমাকে আয়ত্ত করিবে। তুমি রিপুর দাস হইয়া থাকিবে। সমাজে বাস করিতে গেলে, রিপু দমন অত্যাবশ্যক, নতুবা পরস্পরের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, বিবাদ লাগিয়া থাকিবে।

তুমি চা খাও, এজন্য চা ও চিনি প্রয়োজন, হয়ত তোমার সংসারের অবস্থা এমন হইল যে, তোমার পিতা

এই চা ও চিনি সংগ্রহ করিতে অক্ষম। তুমি অভ্যাস করিলেই চা খাওয়া ত্যাগ করিতে পারিবে। যদি ত্যাগ না কর, তোমার বাড়ীতে তুমি অশান্তির কারণ হইবে। তুমি হয়ত বদরাগী, কেহ কোন অনিষ্ট করিলে, বা তোমার কাজে বাধা দিলে তুমি মারিতে উঠ। যদি এই ক্রোধ-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দাও, তোমার সহিত অধিকাংশ লোকের বিবাদ হইবে। বন্ধুবিচ্ছেদ হইবে এবং তুমি শান্তিতে থাকিতে পারিবে না।

তোমার মনে রাগ হইলেই, যদি তুমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাক, দেখিবে, তোমার রাগ কমিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন এইরূপ করিলে ক্রমে তোমার রাগের স্বভাব কমিয়া যাইবে।

এইরূপ অভ্যাস দ্বারা সকল রিপুই দমন করা যায়, মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে ৬৯ অধ্যায়ে উপদেশ আছে—অগ্রে চিত্তজয় করিয়া পরে শত্রুজয়ে প্রবৃত্ত হইবে।

চিত্তজয়ের উপায়ও কথিত আছে ; ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিলে চিত্তজয় করা হয়। আমাদের ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, মুখ, উপস্থ ও পায়ু ; ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ ॥ তদুপরি মন একাদশ ইন্দ্রিয়। পূর্ব্বে যে ৬টী রিপুর কথা বলিয়াছি, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া জন্মে ও বৃদ্ধি পায়। ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিলে রিপু জয় করা যাইবে।

—

ত্রয়োদশ পাঠ

অভ্যাস

অভ্যাসে সমস্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ কর না এবং বই হাতে লইলেই ঘুমাইয়া পড়; যদি এই অভ্যাস ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প লইয়া কার্য্য আরম্ভ কর, দেখিবে, প্রথম প্রথম কষ্ট হইলেও, পরে সকালে উঠা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, ও তাহাতে কষ্ট না হইয়া বরং শরীর ও মনে প্রফুল্লতা আসিয়াছে। বই হাতে লইলে যাহাদের ঘুম পায়, তাহারা যদি কোন সঙ্গীকে কেবল জাগাইয়া দিতে বলে এবং সে যদি কয়েকদিন ধরিয়া তোমাকে ঘুমাইতে না দেয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ ঘুমের অভ্যাস চলিয়া যাইবে।

আমরা অনেকে ভার বহন করিতে পারি না। কিন্তু ভার বহন করা যাহাদের অভ্যাস, তাহারা কেমন স্বচ্ছন্দে ভার বহন করিতে পারে; অভ্যাসের গুণে তাহারা এই শক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে। যে কখনও সাঁতার কাটা অভ্যাস করে নাই, গভীর জলে গেলে সে ডুবিয়া যাইবে। সাঁতার কাটা অভ্যাস করিলে দুস্তর নদী সাঁতার দিয়া পার হওয়া যায়। একটি মেয়ে English Channel সাঁতার কাটিয়া পার হইয়াছিল। যাঁহারা প্রাণায়াম অভ্যাস

করেন, তাঁহারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ, এমন কি অনেক দিন, থাকিতে পারেন। কিন্তু তুমি আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইব। পুরাতন গ্রীসে Demosthenes নামে একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন, তিনি প্রথমে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। পরে চেষ্টা করিয়া বক্তৃতা করা অভ্যাস করেন এবং এতদূর সফল হন যে, বাগ্মিতায় তাঁহার সময়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তোমরা যদি কেহ বাগ্মী বা বীর বা খেলোয়াড় হইতে ইচ্ছা কর, প্রাণপণ করিয়া সেইরূপ অভ্যাস কর, সফলকাম হইবে।

প্রথম অভ্যাস করিতে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট সহ্য করিয়া সেইরূপ কার্য্য করিয়া গেলে আর কষ্টবোধ হয় না।

মনকে সংযত করিয়া একমুখী করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য—পড়ার সময় যদি খেলার কথা উঠে, বা অন্য প্রসঙ্গ উঠে, আমাদের মন স্বভাবতঃ তাহার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অভ্যাস করিয়া মন একাগ্র করিতে পারিলে, কোন কার্য্য করিবার সময় অপর দিকে আদৌ মন যাইবে না, এমনকি সম্মুখে মারামারি হইলেও, কি হইতেছে তাহার কোনও ধারণা হইবে না। অভ্যাস দ্বারা মনকে সংহত ও একাগ্র করিতে পারিলে, জীবনে সফলতা ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভ করা যায়। তোমরা চেষ্টা করিয়া মনকে একাগ্র করার অভ্যাস কর।

তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত দরিদ্র, কিম্বা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছ তোমাদের অবস্থা ভাল থাকা সময়ে যে সকল অভ্যাস ছিল, এখন সে অভ্যাস থাকার জন্য তোমাদের এবং তোমাদের পিতামাতা বা অভিভাবকের কষ্ট হয়। তোমরা ইচ্ছা করিলে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করিতে পার, এবং কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস করিতে পার। তাহাতে তোমাদের ও পিতামাতার মানসিক অশান্তি দূর হইবে।

সংযম

প্রবৃত্তি বা রিপু দমন করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। অথচ করিতে পারিলে, ইহা অপেক্ষা শুভ ফলপ্রদ আর কিছুই নাই। একদিনে এই উদ্যমে ফললাভ হয় না। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়।

মনে কর একটি বালক প্রথম দিন স্কুলে আসিল। বাটিতে থাকা সময়ে সে খেলা করিয়া বেড়াইত, বা বাগানে ফল পাড়িয়া খাইত, বা মাছ ধরিত। স্কুলে পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইবে এবং পাঠে বা শিক্ষকের কথায় তাহার মন বসিবে না। শিক্ষালয়ে থাকিতে প্রথম প্রথম কষ্ট বোধ হইলেও, ক্রমশঃ নূতন ভাবে সময় ক্ষেপন করা তাহার সহ্য হইয়া যাইবে, এবং স্কুলের সময় তাহার খেলা,

বা বাগানে বেড়ান, বা মাছ ধরার কথা মনে আসিবে না।

এইরূপ যদি অসৎ সঙ্গীর সঙ্গ পরিহার করিয়া চল, বা কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে চেষ্টা কর, দেখিবে, প্রারম্ভে কঠিন বলিয়া বোধ হইলেও, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অসৎ সঙ্গীর সহিত মিশিবার বাসনা ক্ষীণ হইয়া আসিবে, এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়না পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে।

এইরূপে প্রবৃত্তি বা রিপু দমন করিবে। ইহাকে সংযম বলে।

——

চতুর্দ্দশ পাঠ

শরীর ও আত্মা

আমাদের শরীর কতকগুলি জড় পদার্থের সমবায়ে নির্ম্মিত।

আমাদের দেহে আকাশ আছে। যেমন মুখ ও ফুসফুস এবং উদরে শূন্য স্থান।

আমাদের দেহে বায়ু আছে। আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি এবং দেহের বিভিন্ন স্থান বায়ুপূর্ণ করিতেছি।

আমাদের দেহে তেজ বা অগ্নি আছে। যতক্ষণ জীবিত থাকি, আমাদের দেহ উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের দেহে জল আছে। রক্ত মূত্র প্রভৃতিতে জল আছে।

আমাদের দেহে পৃথ্বী বা স্থুল পদার্থ আছে, মাংস অস্থি প্রভৃতি।

সুতরাং আমাদের শরীর পঞ্চভূতাত্মক বলিতে পারি।

জীবিত মনুষ্যের শরীরে কিন্তু স্থূল দেহ ভিন্ন আরও অনেক কিছু আছে।

১ম—জীবনের লক্ষণ—প্রাণ। নিঃশ্বাস-বায়ুকে প্রাণ, অধোগামী বায়ুকে অপান, সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া যে বায়ু অবস্থান করে, তাহাকে ব্যান যে বায়ু ভুক্ত অন্ন পানাদির পরিপাক ঘটায়, তাহাকে সমান, এবং উর্দ্ধগামী বায়ু যাহা জীবের প্রাণ বহির্গত করায়, তাহাকে উদান বলে।

সুতরাং দেহে পঞ্চভূত ভিন্ন বায়ু প্রাণও আছে।

এতদ্ভিন্ন জীবিত মনুষ্য কাজ করিয়া থাকে,—সে হস্ত দ্বারা কাজ করে, পদ দ্বারা গমন করে, মুখের দ্বারা কথা বলে ও আহার করে, পায়ু দ্বারা মলত্যাগ করে, উপস্থ দ্বারা মূত্র ত্যাগ করে। এই পাঁচটিকে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। ইহাও প্রত্যেক মনুষ্যের শরীরে আছে।

ইহা ছাড়া মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, যাহা দ্বারা সে বাহিরের বস্তুর জ্ঞান লাভ করে। (১) চক্ষু—ইহার দ্বারা দেখে; (২) কর্ণ—ইহার দ্বারা শুনে; (৩) নাসিকা—ইহার দ্বারা আঘ্রাণ করে;

(৪) জিহ্বা—ইহা দ্বারা রস আস্বাদন করে ; (৫) ত্বক—ইহার দ্বারা স্পর্শ বোধ করে।

ইহা ছাড়া জীবিত মনুষ্যের আর এক ইন্দ্রিয় আছে, তাহার মন। কোন বিষয়ের জ্ঞান উপলব্ধি করিতে হইলে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে মন সংযুক্ত না হইলে জ্ঞান হয় না। যদি কেহ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে, বা নিদ্রিত থাকে তাহার সম্মুখে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা গেলেও সে দেখিতে বা শুনিতে পায় না ; কারণ, তাহার মন সে বিষয়ে থাকে না।

মনই মানুষের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

জীবিত মানুষের বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। ইহাকে বুদ্ধি বলে।

প্রত্যেক মানুষ নিজেকে অপর সমস্ত জীব ও বস্তু হইতে পৃথক জ্ঞান করে। ইহাকে অহঙ্কার বলে।

এইজন্য বলা হয়, আমাদের শরীর পঞ্চভূভ পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সমষ্টি।

কিন্তু যিনি দেখেন, শোনেন, আঘ্রাণ করেন স্পর্শ করেন, রস আস্বাদন করেন এবং মনকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন—তিনি শরীরের মধ্যে থাকিয়াও শরীর হইতে ভিন্ন। তিনিই আত্মা।

——

পঞ্চদশ পাঠ

হিন্দু বালক-বালিকার দৈনিক কর্ত্তব্য

১। প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভগবানের নাম লইয়া শয্যাত্যাগ করিবে। ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিবে এবং স্তব পাঠ করিবে।

২। শয্যা হইতে উঠিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে, মুখ চক্ষু প্রক্ষালন করিবে। দন্তধাবন ও জিহ্বা পরিষ্কার করিবে। তৎপরে স্নান করিবে।

৩। স্নানান্তে পিতামাতাকে, গৃহদেবতাকে ও সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

৪। ইহার পর অধ্যয়নে মনোযোগ দিবে, এবং পিতামাতা বা গুরুজনের নির্দ্দেশমত গৃহকর্ম্ম করিবে।

৫। আহার ঃ—ভোজন করিবার পূর্ব্বে হস্তপদ এবং মুখ প্রক্ষালন করিবে। ভোজনান্তে মুখ ভাল করিয়া ধুইবে এবং পুনরায় হস্তপদ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জল দ্বারা স্পর্শ করিবে।

তিক্ত, কষায় ও মধুর আস্বাদনযুক্ত দ্রব্য নিয়মিত-ভাবে আহার করিলে উহা অমৃতে পরিণত হয়। অতি ভোজন করিবে না। অল্প ক্ষুধা থাকিতে খাওয়া বন্ধ করিবে, নতুবা অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ ইত্যাদি রোগ হইবার সম্ভাবনা।

৬। আহারান্তে পাঠশালা বা স্কুলে গিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ লইবে। বুঝিতে না পারিলে শ্রদ্ধা-সহকারে শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লইবে।

স্কুল না থাকিলে কদাচ দিবা ভাগে ঘুমাইবে না। বাটীতে বসিয়া পাঠাভ্যাস বা পিতামাতার নির্দ্দিষ্ট গৃহকর্ম্ম করিবে।

৭। অপরাহ্ণে খেলাধূলা করিবে। সহপাঠী বা খেলার সাথীদের সঙ্গে বিবাদ, মারামারি বা ঝগড়া করিবে না। এক সঙ্গে খেলার সময়, সর্ব্বদা নির্ব্বিচারে দলের সর্দার বা Captain-এর আদেশ মত কাজ করিবে, দলের যাহাতে জয় হয়, সেই ভাবে কাজ করিবে। নিজের কৃতিত্ব দেখাইব, দলের পরাজয় হয় হউক, এই মনোভাব লইয়া খেলিবে না।

৮। সন্ধ্যার সময় তুলসীমঞ্চে বা গৃহদেবতার গৃহে প্রদীপ দেওয়া হইলে, তথায় প্রণাম করিয়া মন দিয়া পর দিনের পাঠ অভ্যাস করিবে, বা পিতামাতার নির্দ্দেশমত গৃহকর্ম্ম করিবে।

৯। পাঠাভ্যাসের পর, অধিক রাত্রি না করিয়া, দিবাকাল অপেক্ষা লঘু আহার করিবে।

১০। আহারান্তে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব এবং নিজ

পারিবারিক ইতিহাস, বা স্বদেশের কথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের নাম লইয়া শয়ন করিবে।

১১। নিজ বংশের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদিগের নিকট বংশের ইতিহাস, বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নাম, ও তাহাদের গল্প শুনিবে এবং পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, মাতা পিতামহী প্রপিতামহী, মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধ-প্রমাতামহ, মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধ-প্রমাতামহীর নাম ও গোত্র মুখস্থ করিবে।

১২। স্বদেশের স্বজাতির ইতিহাস ও গল্প শুনিবে, এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নাম ও তাঁহাদের জীবনী শুনিবে।

১৩। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে ব্যায়াম ও প্রাণায়াম করিবে। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হয়।

১৪। ব্যবহার ঃ

(ক) অসৎপ্রকৃতি বালক-বালিকার সহিত মিশিবে না বা খেলায় তাহাদের সঙ্গী হইবে না।

(খ) ভ্রাতা-ভগিনী ও সহপাঠীর প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করিবে, সর্ব্বদা তাহাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করিবে।

(গ) গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে। তাঁহাদিগকে অপমান বা তাচ্ছিল্য করিবে না।

(ঘ) গুরুজনের ব্যবহৃত শয্যা বা আসন ব্যবহার

করিবে না। গুরুজন সমাগত হইলে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিবে এবং পায়ে মাথা ছোঁয়াইবে।

(ঙ) প্রতিবেশীর প্রতি সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিবে।

(চ) তোমার বাটীর বা পরিচিত কাহারও অসুখ হইলে, যথাসাধ্য সেবা করিবে। সকলের সুখে-দুঃখে সহানুভূতি করিবে।

(ছ) উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও যাইবে না এবং দাঁড়াইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

(জ) যানারূঢ়, ভারবাহী, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রীলোক, রাজা, এবং বিবাহার্থ গমনশীল শোভাযাত্রা প্রভৃতিকে পথ ছাড়িয়া দিবে।

১৫। স্বীয় পিতামাতার মৃত্যু হইলে তাহার তারিখ ও তিথি মুখস্থ করিয়া রাখিবে।

১৬। স্বজাতির লোককে সর্ব্বদা সাহায্য করিবে ও রক্ষা করিবে।

১৭। সর্ব্বদা নিজ অধিকার, জাতির অধিকার, স্বধর্ম্মের অধিকার রক্ষা করার চেষ্টা করিবে। ইহাতে অন্যের সহিত বিবাদ মারামারি করিতে হয়, তাহাও করিবে। বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কদাচ প্রাণভয়ে পলাইবে না। সাহসী ব্যক্তি সম্মুখ-যুদ্ধে প্রহৃত হইলে, তাঁহার

পাপ নাশ হয় এবং আঘাত হেতু মৃত্যু হইলে অক্ষয় স্বর্গ-লাভ হয়। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা।

১৮। যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয়, কিন্তু ভয়ের আশঙ্কা থাকে, ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইলে, নির্ভীক চিত্তে প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। মনুষ্য সঙ্কটে পতিত না হইলে কদাচ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। সঙ্কটে পতিত হইয়া মুক্তি লাভ করিলে সমস্ত মঙ্গল লাভ হয়।

১৯। বালিকাগণ মাতা, পিতামহীর নিকট ব্রতকথা শুনিবে এবং ব্রত লইয়া তাহা পালন করিবে। এই সকল ব্রত পালনে সংযম শিক্ষা হয় এবং গৃহকর্ত্রী হইবার যোগ্যতা জন্মে। বালিকাদের বৃদ্ধাদের নিকট সহজ মুষ্টিযোগ ও গ্রাম্য ঔষধাদি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় ভাগ

হিন্দু ধর্ম্ম

যদিও এখন আমরা আমাদের ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলি, আসলে আমাদের ধর্ম্মের নাম শুধু ধর্ম্ম বা মানব ধর্ম্ম।

আমাদের শাস্ত্রে অর্থাৎ বেদে, স্মৃতিতে, পুরাণে হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। বিদেশীরা ভারতবাসীদের হিন্দু

বলিত। ভারতবাসীদের ধর্ম্ম, এই হিসাবে আমাদের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম।

আমাদের শাস্ত্র বেদ, পুরাণ প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজার কথা লেখা আছে বটে, কিন্তু অমুক দেবতাকে পূজা না করিলে, বা না মানিলে সে হিন্দু নয়, বা ধর্ম্ম আচরণ করিল না, কিম্বা তাহাকে নরকভোগ করিতে হইবে, এমন কথা কোথাও নাই।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় ধর্ম্মের লক্ষণ বলা আছে—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এতচ্চতুর্ব্বিধঃ প্রাহু সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ ২—১২

অর্থাৎ যাহারা (১) বেদ, (২) স্মৃতি, (৩) সদাচার (৪) এবং যাহাতে আত্মপ্রসাদ জন্মে এইরূপ কার্য্য, এইগুলি মানিয়া চলে বা করে তাহারাই ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে।

এখানে বেদ অর্থে সম্পূর্ণ বেদ—ক্রিয়াকাণ্ড, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ সমস্তই বুঝাইতেছে।

পুনরায়—ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥ ৬-৯২

অর্থাৎ ১। ধৃতি—সন্তোষ ২। ক্ষমা ৩। দম (কুপ্রবৃত্তি দমন) ৪। অস্তেয়—চুরি না করা ৫। শৌচ—মনকে আয়ত্ত করা, শাস্ত্র-বিহিত নিয়মে জল মৃত্তিকা দ্বারা

দেহ শুদ্ধ করা, ৬। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা। ৭। ধী—বুদ্ধি ৮। বিদ্যা ৯। সত্য ১০। অক্রোধ—রাগের বশীভূত না হওয়া, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টান ধর্ম্মে যেমন যীশু-খৃষ্টকে মানিতে হয়, মুসলমান ধর্ম্মে যেমন ভগবানকে ও মহম্মদকে ভগবানের প্রেরিত পয়গম্বর বলিয়া মানিতে হয়, হিন্দু ধর্ম্মে সেরূপ কোন বিশেষ দেবতা, বা মানুষ, বা অবতারকে মানিতে হইবেই এইরূপ বিধান নাই।

হিন্দুধর্ম্ম মূলতঃ নৈতিক, ও ব্যক্তিগত আচরণ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী। যাঁহারা ঐ নিয়ম মানিয়া চলেন, যে কোনও দেবতার পূজা করুন বা নাই করুন, তাঁহারা হিন্দু।

হিন্দু আপন বিচার-বুদ্ধি ও সাধনা দ্বারা এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন যে, পরব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প ও নিরাকার। তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহাতে গুণের বিকাশ হইয়াছিল, এবং সগুণ হইয়া তিনি নানা কার্য্য করিয়াছেন, করিতেছেন, ও করিবেন।

আর একটি সত্য তাঁহারা নির্দ্ধারণ করেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, জড়, চেতন, স্থাবর, জঙ্গম, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা, ইত্যাদি সমস্তই ব্রহ্ম।

হিন্দুরা ভগবানের গুণাবলীর কোন এক বিশেষ গুণ

লইয়া সেই গুণাভিমানী দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করেন, অথবা তিনি যে সকল কার্য্য বা লীলা করিয়াছেন, তখন যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে মূর্ত্তি কল্পনা করেন; এবং তাঁহার পূজা করেন। সুতরাং সকলে সেই এক ভগবানকেই পূজা করিতেছেন, ইহাতে বিয়োগ বা মতানৈক্যের স্থান নাই।

ভগবানের গুণ, মূর্ত্তি ও শক্তি যখন অশেষ, তখন পূজা করিবার মূর্ত্তিরও সংখ্যা বা সীমা নাই। এই জন্য বলা হয় হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা—দেবতা এক—তাঁহার তেত্রিশ কোটি—অর্থাৎ বহু রূপ ও গুণ।

হিন্দুধর্ম্মের নিন্দুকেরা এবং আমাদের মধ্যে যাঁহারা লেখাপড়া জানেন বলিয়া অভিমান করেন তাঁহারা, প্রকৃত তথ্য না জানিয়াই, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা বলিয়া বিদ্রূপ করেন। ইহাতে কোনও লাভ ত' হয়ই না, বরং, সাধারণের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর আঘাত লাগে।

মন্ত্র সম্বন্ধেও অনেকে বলেন যে, উহা দুর্ব্বোধ্য, অর্থহীন শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি মাত্র। শব্দ ও শব্দ উৎপত্তির যে গভীর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিন্দুধর্ম্মে আছে,—যাহা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মে বা দেশে নাই,—তাহা অবগত হইবার চেষ্টা না করিয়া, অল্প বুদ্ধিবশতঃ এই সমস্ত কটাক্ষ করা হয়। আমাদের

শাস্ত্র এবং দর্শন অনুসারে, যোগীগণের উপলব্ধি অনুসারে, মন্ত্রই দেবতা এবং বিধিমত মন্ত্র সাধনা করিলে, দেবতা সাধকের সম্মুখে আবির্ভূত হন।

সাধারণ মানুষ যাহা ধারণা করিতে পারে না, বা দেখিতে পায় না, তাহার অস্তিত্ব বহু উপায়ে প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। ভগবান ও তাঁহার বিভিন্ন মূর্ত্তি সাধারণে দেখিতে পায় না, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নাই, বা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা স্থির করা মূর্খতা হইবে। আধুনিক সময়েও অনেকে সাধু সন্ন্যাসীদের কৃপায় দেবতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় স্বামী বিবেকানন্দ দেবতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হয়।

২। ভগবানের রূপ

জগতে একমাত্র ভগবান ভিন্ন অন্য কোনও সৎ পদার্থ নাই। সুতরাং একমতে সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাহাতে অনন্ত আকাশ গ্রহ নক্ষত্রাদি, অশেষ প্রকারের জীবজন্তু, পশুপক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি আছে, এই সমষ্টিরূপই ঈশ্বরের বিরাট রূপ বা বিশ্বরূপ।

মানুষের মন এই বিশ্বরূপ ধারণা করিতে পারে না। ভগবানের কৃপা ব্যতীত বিশ্বরূপ দর্শন করার ক্ষমতা হয় না, অন্যমতাবলম্বীরা বলেন যে ইহা ত সৃষ্টির রূপ সৃষ্টিকর্ত্তার

রূপ নহে। হিন্দু দার্শনিকেরা বলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টি —গুণী ও গুণ—পৃথক নহেন।

ভগবান ধারণার অতীত, তাঁহাকে মন দিয়া ধারনা করা বা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। ধর্ম্মপথে থাকিয়া উন্নতি করিলে যোগ দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় মাত্র।

সাধক ও ভক্তগণের সুবিধার জন্য, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন গুণ, কর্ম্ম ও লীলা অনুসারে তাঁহার বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়।

জগতের সৃষ্টি ভগবান করেন সৃষ্টিকর্ত্তাকে ব্রহ্মারূপে কল্পনা করা হয়।

ভগবান জগৎ পালন করেন, পালনকর্ত্তাকে বিষ্ণুরূপে কল্পনা করা হয়।

ভগবান জগৎ সংহার করেন, সংহারকর্ত্তাকে রুদ্ররূপে কল্পনা করা হয়।

ভগবান জগৎ মাতা—জগন্মাতাকে অম্বিকারূপে কল্পনা করা হয়।

ভগবান বিদ্যা দান করেন বিদ্যাদায়িনীকে সরস্বতী-রূপে কল্পনা করা হয়।

ভগবান ধনধান্য দান করেন, ধনধান্যদায়িনীকে লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করা হয়।

ভগবান অসুর দমন করেন অসুরদলনীকে দুর্গারূপে কল্পনা করা হয়।

ভগবান প্রকৃতিরূপিণী সৃষ্টি - স্থিতি - সংহারকর্ত্রী, তাঁহাকে কালীরূপে কল্পনা করা হয়।

মুখ্যত অরূপ হইলেও, এইরূপ একই ভগবানের স্ত্রী পুরুষ বহু মূর্ত্তি। ভগবানের বিভিন্ন লীলার স্মারকরূপেও তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করা হয়, যেমন—রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণ। মানুষ যাহাতে ভগবানের গুণ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে, তাহার সাহায্যার্থ, এবং মনোনিবেশ সহকারে গুণাবলী চিন্তা করিতে পারে, সেই জন্য, বিভিন্ন মূর্ত্তি গঠন বা চিত্রাঙ্কন করা হইয়া থাকে।

মানুষের মনের উন্নতি স্তর ভেদে অসমানভাবে হইয়া থাকে। উন্নত স্তরের মানুষ দেবতার বা তাঁহার গুণাবলীর যেরূপ ধারণা বা ধ্যান করিতে পারে, নিম্নস্তরের লোক তাহা পারে না, তাহাদের পক্ষে জড়পদার্থে দেবত্ব আরোপ করা সহজসাধ্য, এবং জগতের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন বস্তুতে, দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকে ; কিম্বা অশরীরী আত্মাকে পূজা করে। তাহাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষায় জড়োপাসক বা ভূতোপাসক বলা হয়।

বস্তুতঃ তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসক। হিন্দু ধর্ম্মে দেবতার কোন সংখ্যা বা সীমা নাই। জগৎ-স্রষ্টা, জগৎ-পাতা বা জগৎ-সংহর্ত্তার গুণাবলীর মধ্যে কোন এক গুণের উপাসনা করিলেই দেবতার উপাসনা করা হইল।

তোমরা ইহাদিগকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করিও না, ইহারা

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিশু। আবার তথাকথিত একেশ্বরবাদীও উন্নত স্তরের মানুষের নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিশু। সকলেই ভগবানকে ধারণা করিবার তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার, তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করিনেছে। কেহই নগণ্য নহে বা অন্ত্যজ বা ধর্ম্মবহির্ভূত নহে। তাহারা সকলেই হিন্দু, রাষ্ট্রনৈতিক কারণবশতঃ তাহাদিগকে হিন্দু পর্য্যায় হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল মাত্র।

৩। মন্ত্র

মন্ত্রশক্তি ঃ—শুদ্ধভাবে মন্ত্রের চৈতন্য সাধন করিয়া, মন্ত্রের অর্থবোধকরতঃ দেবতার পূজাপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে মন্ত্রের ফল পাওয়া যায়, বিধিমত পূজা করিয়া মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণে, বা মৃত সঞ্জীবনী হোমে, মুমূর্ষু রোগী প্রাণ লাভ করিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

মন্ত্র কি, তাহা আমাদের অনেকের জানা নাই। অনেকে বলেন—মন্ত্র কতকগুলি অর্থহীন বাক্য বা শব্দ-সমষ্টি মাত্র; এ কথা তাঁহাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। বীজমন্ত্র দেবতার শব্দময় রূপ। বিহিত বিধানে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, দেবতার আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন মন্ত্র। মন্ত্রের প্রতি কখনও অপমান বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিবে না। ঋষিগণ একাগ্রমনে দেবতার

ধ্যান করিতে থাকা কালে, তাঁহাদের মনে মন্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহারা সেই সব মন্ত্র প্রচার করেন।

৪। পূজা

পূজা দুই প্রকার—বাহ্যিক ও মানসিক। বাহ্যিক পূজায় দেবতার মূর্ত্তি, পট, ঘট ইত্যাদিতে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা করা যায় না। ইহাই শাস্ত্রবিধি। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, হিন্দু যে বিগ্রহ প্রতিমা পট বা ঘট পূজা করে, সেই দেবতাকে মনে ধ্যান করিয়া নিজ শরীর মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাঁহার মানস পূজা করে, পরে বাহিরের প্রতীকে অর্থাৎ বিগ্রহ প্রতিমা পট বা ঘটে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঐ প্রতীকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূজকের অন্তর হইতে আসিয়া দেব দেবী বহিঃস্থ প্রতীকে অধিষ্ঠান করেন। তথায় ভক্তের বা যজমানের বাহ্য পূজা গ্রহণ করিয়া তাহার ভক্তি, একাগ্রতা এবং কর্ম্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করেন।

মানস পূজায় নিজ দেহমধ্যে দেবতাকে ধ্যান করিতে হয় এবং নিজ সত্ত্বা দেবতার সত্ত্বায় মিলিত করিতে হয়। সুতরাং দেহ ও মন পবিত্র করা প্রয়োজন ও দেহ এবং মন যে পবিত্র হইয়াছে, ইহা নিজে অনুভব করাও প্রয়োজন। হিন্দুনামধারী আধুনিকেরা বাহ্য ও আভ্যন্তর

শৌচের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা লইয়া বিদ্রূপ করিলেও, উহা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উহা না করিলে মনে পূজার অনুকূল অবস্থা আনয়ন করা যায় না, ইহা বালকেও বুঝিতে পারে।

স্নান, হস্তপদ মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতি বাহ্য শৌচ। শ্রীবিষ্ণু স্মরণ এবং কর ও অঙ্গন্যাস—যাহাতে নিজ দেহের ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবী অবস্থান করিতেছেন এই মনে করা হয়, তাহাই আভ্যন্তর শৌচ। মন হইতে কুচিন্তা, বিষয় চিন্তা প্রভৃতি দূর করিতে হইবে। যখন দেহ ও মন পবিত্র হইয়াছে মনে হইবে, তখন পূজায় অধিকার জন্মিবে।

মানস পূজায় উপচার

পঞ্চোপচার	গন্ধ	মহীতত্ত্ব
	পুষ্প	আকাশতত্ত্ব
	ধূপ	বায়ুতত্ত্ব
	দীপ	তেজতত্ত্ব
	নৈবেদ্য	তোয়তত্ত্ব

দেহ পঞ্চভূত-নির্ম্মিত। দেবতাকে ঐ পঞ্চতত্ত্ব উপহার দিলে, দেহ দেবতার বোধ হয় এবং উহাতে আত্মবুদ্ধি নাশ হয়।

মানস পূজার বলিঃ—কাম এবং ক্রোধকে বলি দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, কাম এবং ক্রোধ এই দুই প্রবল রিপু

দেবতা বলি গ্রহণ করিয়া পূজককে তাহাদের প্রভাবমুক্ত করুন ও ইন্দ্রিয় সংযমে সহায় হউন।

পুষ্প ঃ—অমায়মনহঙ্কারম্ অরাগমমদস্তথা।

অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।

অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥

১। মায়ার অভাব, ২। অনহঙ্কার, ৩। রাগের (আসক্তি) অভাব, ৪। মদের (গর্ব্ব) অভাব, ৫। মোহের অভাব, ৬। দন্তের অভাব, ৭। দ্বেষের অভাব, ৮। অক্ষোভ, চাঞ্চল্যের অভাব, ৯। অমাৎসর্য্য—ঈর্ষ্যার অভাব, ১০। অলোভ—এই দশটি পুষ্প মানস-পূজায় দিতে হয় অর্থাৎ নিজ মনকে এই সকল বৃত্তিসম্পন্ন করিতে হয়।

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।

দয়া ক্ষমা জ্ঞান পুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং ততঃ পরম্॥

পরম পুষ্প পাঁচটি ১। অহিংসা, ২। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ৩। দয়া, ৪। ক্ষমা, ৫। জ্ঞান—এই পাঁচটি পুষ্পও দিতে হয়।

এখন আমরা দেখিতেছি যে, এই পূজা প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক ও মানুষকে সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণসম্পন্ন ও সংযমী হইতে চেষ্টিত করে। সুতরাং পূজা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

বাহ্যপূজা আমরা মানুষ, সেইজন্য মানুষের জীবনযাত্রায় যাহা যাহা আবশ্যক, ও মানুষ যাহাতে আনন্দ সুখ বা তৃপ্তি বোধ করে, দেবতার পূজায় সেই সকল জিনিষ উপহার দিয়া পূজা করি।

প্রত্যেক উপচার দিবার পূর্ব্বে তাহাকে পূজা করিতে হয়। পরে ঐ দ্রব্যের অধিপতি বিষ্ণুকে পূজা করিবে। তৎপরে যে দেবতাকে সম্প্রদান করিবে, তাহাকে পূজা করিবে। তৎপরে ঐ দ্রব্য দেবতাকে নিবেদন করিবে। ইহাতে ঐ দ্রব্যাদি জড়পদার্থ নহে ক্রমে ইহা জ্ঞান হইবে।

উপচার—১। আসন, ২। স্বাগত, ৩। পাদ্য ৪। অর্ঘ্য, ৫। আচমনীয়, ৬। মধুপর্ক, ৭। স্নানীয় ৮। বসন, ৯। আভরণ, ১০। গন্ধ, ১১। পুষ্প, ১২। ধূপ ১৩। দীপ ১৪। নৈবেদ্য ১৫। পুনরাচমনীয়, ১৬। নমস্কার। এতদ্ভিন্ন তাম্বুল, গৃহ, শয়ন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, আরতি ইত্যাদিও পূজায় দেওয়া হয়।

ভক্তি না হইলে পূজার কোন ফল নাই। একান্ত মনে ভক্তিসহকারে পূজা করিলে মনে আনন্দ পাওয়া যায়, এবং কাম্য পূজার ফল লাভ করা যায়। কোন উপকরণ না থাকিলেও, ভক্তিভরে কেবল জল প্রদান করিয়া পূজা করা যায় এবং তাহাতেই ফল লাভ করা যায়। তাই বলিয়া একথা বলিতেছি না যে, ভক্তি না হইলে পূজা অর্চ্চনা করিবে না। দেখা গিয়াছে যে, প্রথমে ভক্তি না

থাকিলেও, পূজা করিতে করিতে, বা জপ করিতে করিতে, ভক্তি আসে ও সিদ্ধিলাভ হয়। উদাহরণস্বরূপ দস্যু রত্নাকর, রামনাম জপ করিয়া বাল্মীকি ঋষি হওয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মানসিক পূজাতে দেব-বিগ্রহের প্রয়োজন নাই, কোন উপকরণও দরকার হয় না। দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, মনে মনে তাঁহার পূজা করিলেই ফল লাভ হয়। সকল পূজা একাগ্রমনে করা কর্ত্তব্য, নচেৎ ফল লাভ হয় না।

আহ্নিক, ত্রিসন্ধ্যা :—নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই ভগবানের নাম উচ্চারণকরতঃ গাত্রোত্থান করিবে। প্রত্যেক হিন্দু উপবীত গ্রহণের, বা দীক্ষা লইবার পর, প্রতিদিন তিনবার গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন। প্রথমে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, দ্বিতীয় মধ্যাহ্নে, তৃতীয় সায়ং বা সন্ধ্যাকালে।

পূজা আহ্নিক করিবার পূর্ব্বে হাত মুখ পা ধুইবে। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে। নিজের দেহ ও মনশুচি করিবে। শুদ্ধ আসনে বসিয়া মন স্থির করিয়া পূজা ও আহ্নিক করিবে।

৫। দশবিধ সংস্কার

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি হিন্দুর জীবনে অন্যূন দশটা সংস্কার বিহিত আছে। কেবল শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার বিহিত নাই। আমাদের বঙ্গদেশে বহু ব্যক্তি এক

সময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরে তাঁহারা পুনর্ব্বার হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তাঁহারা উপবীত গ্রহণ না করায় তাঁহাদের বংশীয় লোকেরা শূদ্র পর্য্যায়ে পড়িয়া আছেন। সকলের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বিবাহ। এই সংস্কার দ্বারা, স্ত্রী ও পুরুষকে এক করা হয়।

বিবাহের মন্ত্রমধ্যে আছে—

'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব' আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক অর্থাৎ দুই জন একমন ও একপ্রাণ হই। এই মন্ত্র মনে রাখিয়া কাজ করিলে সকল সংসার সুখের হয়।

অন্য সংস্কার। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন—

এইগুলি শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বের সংস্কার।

জাতকর্ম্ম। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র করিতে হয়।

নামকরণ, নিষ্ক্রামণ. অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ।

এইগুলি পরের সংস্কার। প্রত্যেক সংস্কারের পূর্ব্বে শুচি ও সংযত হইয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী ভিন্ন সকলের দেহ অগ্নিতে দাহ করিতে হয়। ইহাই শরীর সম্বন্ধে শেষ কৃত্য।

মাঙ্গলিক ক্রিয়া

প্রত্যেক সংস্কারের প্রারম্ভে এবং অন্য মাঙ্গলিক

ক্রিয়াতেও সকল দেবতার পূজায় প্রথমে বিঘ্ননাশক এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করিতে হয়।

পরে ঘটস্থাপন এবং স্বস্তিবাচন করিতে হয়। অন্য দেবতার পূজায় নারায়ণ শিলা আনাইয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়। পরে ঘটে দেবতা আবির্ভূত হইয়াছেন কল্পনা ও বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে হয়।

যে ক্রিয়াই করা হউক না কেন—চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ বা দেবতা পূজা—সকল ক্ষেত্রে পূর্ব্বে সংকল্প করিতে হয়।

সংকল্প করিবার পর ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস আদি দ্বারা নিজ দেহ এবং পূজার স্থান শুদ্ধ করিয়া, প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত-স্থির ও একাগ্রকরতঃ দেবতার ধ্যানপূর্ব্বক মানস ও বাহ্য পূজা করার বিধি আছে। এই সকল করার উদ্দেশ্য এই যে, যে কাজ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ-রূপে অবহিত হইয়া কাজ করিবে, এবং তোমার কৃত কাজ যাহাতে অভীষ্ট ফলপ্রদ হয়, তজ্জন্য আরাধিত দেবদেবী-গণের নিকট ভক্তিভাবে একাগ্র মনে প্রার্থনা করিবে। যে কাজ করিতেছ তাহাতে যদি বিশ্বাস না থাকে এবং কেবল লোকাচার হিসাবে অর্থবোধ না করিয়া কতকগুলি বুলি আওড়াইয়া যাও, তাহাতে ফললাভ ত' হইবে না বটেই, পরন্তু অন্য লোকের চক্ষে তোমার ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট

ক্রিয়াকে মিথ্যা বুজরুকী এবং অবজ্ঞার বিষয় করিবে। প্রত্যেক সংস্কারের পূর্ব্বে যাহার সংস্কার হইবে তাহার অধিবাস কার্য্য করিতে হয়।

হিন্দুরা যে সকল দ্রব্য মাঙ্গলিক, শুভ ও পুণ্য বলিয়া মনে করেন, সেই সকল দ্রব্য আনুষ্ঠানিকভাবে মস্তকে স্পর্শ করাইয়া করণীয় কার্য্য শুভ ফলপ্রদ হউক, এই কামনাই অধিবাস।

মাঙ্গলিক দ্রব্য :—১ (মহী) বা মাটি, গঙ্গামৃত্তিকা ২। চন্দন ৩। শিলা (পাথরের নুড়ি) ৪। ধান্য ৫। দূর্ব্বা ৬। পুষ্প ৭। ফল (কদলী বা হরীতকী) ৮। দধি ৯। ঘৃত ১০। স্বস্তিক (পিটুলির প্রস্তুত ত্রিকোণাকার যন্ত্র) ১১। সিন্দুর ১২। শঙ্খ ১৩। কজ্জল ১৪। রোচনা (গোরোচনা অভাবে হরিদ্রা) ১৫। সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ) ১৬। স্বর্ণ ১৭। রৌপ্য ১৮। তাম্র ১৯। চামর ২০। দর্পণ (আয়না) ২১। দীপ ২২। প্রশস্তি-পাত্র বা বরণডালা, যাহাতে ঐ সমস্ত দ্রব্য থাকে। ইহা ভিন্ন অন্য ধাতুপাত্রে পিটুলী দিয়া "শ্রী" গড়া হয়, তাহাও স্পর্শ করা হয়।

ঐ সকল দ্রব্য স্পর্শ করার পর মাঙ্গল্য-সূত্র হাতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। হাতে-কাটা সূতা হরিদ্রা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া মাঙ্গল্য-সূত্র প্রস্তুত হয়।

মাঙ্গলিক কার্য্যে বসুধারা দেওয়া হয়। ক্রিয়া-

মণ্ডপের দেওয়াল-গাত্রে ক্রিয়া-কর্ত্তার নাভির সমসূত্রপাতে ৫টি বা ৭টি সিন্দূর ফোঁটা দিয়া তথা হইতে ঘৃতের ধারা দেওয়া হয়, এবং চেদীরাজ বসুর পূজা করা হয়।

প্রত্যেক মাঙ্গলিক কার্য্যে ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হয়। এই সকল কাজ করিয়া সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি-জলে স্নান করিতে হয়।

প্রত্যেক সংস্কারের সময় **নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ** করিতে হয়। নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পিতৃগণ আনন্দিত হইয়া পূজা এবং পিণ্ড গ্রহণ করিতে আসিতেছেন, এই মনে করিয়া তাঁহাদিগকে পিণ্ড দান করা হয়।

৬। পাপ-পুণ্য

বিধি-নিষেধের উল্লঙ্ঘনকে পাপ বলা হয়।

ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় বিধির উল্লঙ্ঘন সম্বন্ধে পাপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এখন যে আইন প্রচলিত, ঐ সকল আইন কতকগুলি নীতিমূলক। সেই আইনের উল্লঙ্ঘন পাপ, কারণ তাহা দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু আরও অনেক আইন আছে, যাহার উদ্দেশ্য দেশে নীতি প্রতিষ্ঠা নহে, শাসনকর্ত্তাদের শাসন ও শোষণনীতির প্রতিষ্ঠা। তাহার উল্লঙ্ঘন বে-আইনী, কিন্তু তাহাকে পাপ বলে না। অনেক সময়ে ধর্ম্ম ও নীতির বিধানও উল্লঙ্ঘন করার প্রয়োজন হয়, এবং তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয় না;

যেমন শত্রু আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তুমি তাহাকে বধ করিলে। মানুষকে হত্যা করা সাধারণতঃ পাপ, কিন্তু তোমার মত বিশেষ অবস্থায় পড়িলে আত্মরক্ষার জন্য হত্যা পাপ নহে। আবার তুমি যদি যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়া থাক, এবং তখন তোমার মনে হয়, জীব-হত্যা মহাপাপ, ঐরূপ হত্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা যে রাজ্য প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করিতেছ, তাহা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভাল, তুমি মহাপাপ করিবে। ভগবান বলিয়াছেন যে, ঐরূপ মনোবৃত্তি ক্লীব অর্থাৎ কাপুরুষের এবং তাহা পাপজনক, এবং তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য যে উপদেশ দেন, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মূল এই সত্য মনে রাখিতে হইবে যে—আত্মরক্ষা, অর্থাৎ নিজের প্রাণ, সম্মান, অধিকার, ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রাণীবধ করা, বা অপরকে আঘাত করা, পাপ নহে, বরং ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া-কর্ম্ম বিহিত আছে, তাহা শুদ্ধমনে সম্পন্ন করাতে পুণ্য হইয়া থাকে। সাধারণের ও ব্যক্তিবিশেষের হিতসাধন করাও পুণ্যজনক। তাহাতে বিমল আনন্দ পাওয়া যায়।

আমরা হিন্দুরা জন্মান্তর-বাদ মানি, শাস্ত্রমতে পূর্ব্ব-জন্মে যে কাজ করা যায়, পর-জন্মে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। পাপ-পুণ্যের ফল কতক এই জন্মে,

কতক ভবিষ্যৎ জন্ম-জন্মান্তরে, মানুষকে ভোগ করিতেই হয়। পাপ-পুণ্যের বিচার করা বড়ই দুরূহ, ভগবান অন্তর্যামী, তিনি মানুষের মন দেখিতে পান, ও কে কি উদ্দেশ্যে কি কাজ করিতেছে, তাহা তাঁহার অগোচর নহে। তিনি বিচার করিয়া প্রত্যেককে তাহার কর্ম্মফল ভোগ করান। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৭৮ অধ্যায়ে কথিত আছে—দেশ কাল ও কারণ ভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়, ইহাই সত্য।

৭। প্রায়শ্চিত্ত

পাপক্ষালনের জন্য হিন্দুধর্ম্মে তীর্থ-ভ্রমণ, তীর্থে স্নান ও পূজা এবং অন্য ক্রিয়াদি (যেমন চান্দ্রায়ণ) করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। হিন্দুধর্ম্মে পাপকার্য্যের গুরুত্ব ভেদে পাপ-কারীর শরীরের ক্লেশদায়ক বহুবিধ ক্রিয়ার বিধান আছে। এমন কি, পাতক ভেদে তুষানলে দেহ দগ্ধ করিয়া মৃত্যুর বিধানও আছে।

হিন্দুর শাস্ত্রে পাপকর্ত্তার কার্য্যের জন্য অন্য কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপক্ষালনের বিধি নাই, তবে পুরাণে একজনের পাপ বা পুণ্যফল অন্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ বা দানের দৃষ্টান্ত আছে।

পাপকার্য্যে দেহের ও মনের যে অবনতি হয়, তাহা

হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে, পাপকর্ত্তার নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আগ্রহ দরকার। নিজের প্রবৃত্তি অন্য কাহারও কার্য্য দ্বারা দমন হয় না, নিজেই তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই পাপকার্য্যের ফল ভোগ এবং ক্ষয় হইয়া থাকে।

৮। মৃত্যু

হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে পঞ্চভূতাত্মক দেহের নাশকে মৃত্যু বলে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে মানুষের তিন প্রকার শরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর।

স্থূল শরীরের বিনাশ হইলেও সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর থাকে।

সূক্ষ্ম-শরীরে ইন্দ্রিয়গ্রাম সূক্ষ্মভাবে থাকে, মন বুদ্ধি অহঙ্কারও থাকে।

কারণ-শরীরে মানুষের কৃত কার্য্যের ফল বীজ বা সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে।

পুনর্জ্জন্মের পূর্ব্বে সূক্ষ্ম-শরীর বিনষ্ট হয়। কিন্তু কারণ-শরীর বিনষ্ট হয় না। কারণ-শরীর জীবাত্মার সহিত পুনরায় নূতন শরীর আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে। এই-জন্য কোন কোন জাতককে জন্মাবধি সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ

বা গণিতে পারদর্শী দেখা যায়, পূর্ব্বের সংস্কার প্রবল থাকায় এইরূপ হইয়া থাকে।

যখন জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ নিজের আত্মা ও পরব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান হয়, তখন কারণ-শরীর বিনষ্ট হয়, তৎপরে আর জন্ম-মৃত্যু থাকে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মৃত্যু বা নাশ নাই।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মানুষ যেমন পুরাতন জীর্ণ কাপড় ফেলিয়া নূতন কাপড় পরে, দেহী বা জীবাত্মা সেইরূপ দেহান্তর গ্রহণ করেন, সুধীব্যক্তি ইহাতে মোহগ্রস্ত বা শোকগ্রস্ত হন না।

৯। জন্মান্তর-বাদ

হিন্দু মাত্রেই মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে।

তোমরা যদি মহাপুরুষদের ও ঋষিদের বাক্যে বিশ্বাস কর, জানিতে পারিবে, তাঁহারা অনেকে জাতিস্মর অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কে কি ভাবে জন্মিয়াছিলেন, ও কে কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা স্মরণ করিতে পারিতেন। শ্রীশ্রীগৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তাঁহার

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয়। এই সকল কথা বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্ম, জন্মান্তর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়, একথা মানেন না। তাঁহারা বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা সূক্ষ্ম দেহে বর্ত্তমান থাকে, এবং শেষ বিচারের দিন, তাহারা স্থূল দেহ প্রাপ্ত হইয়া বিচারের জন্য জগদীশ্বরের সম্মুখে নীত হয়, এবং তিনি তখন তাহাদের কার্য্যাবলী বিচার করিয়া পুণ্যবানকে স্বর্গে, ও পাপীকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করেন। আমরা হিন্দুরা বলি যে, ভগবান ব্যতীত জগতে অন্য কোন সত্তা নাই ; অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুর অস্তিত্ব নাই। আমাদের সকলের ভিতরেই ভগবান আছেন, এবং লয়কালে আমরা তাহাতে লীন হইব, অর্থাৎ তখন আমাদের কাহারও পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে না ; ইহা মানিলে অনন্ত নরক ভোগ ঘটীতে পারে না। যতদিন মানুষের অহং-বুদ্ধি থাকে, অর্থাৎ সে অন্য মানুষ, ও অন্যান্য জীব, ও জড়বস্তুর সহিত নিজের পার্থক্য অনুভব করে, ততদিন তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। অহং-বুদ্ধির লোপ হইলে, তাহাকে পুনর্জন্ম লইতে, বা কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। খৃষ্টীয় বা মুসলমান ধর্ম্মেও বলিয়া থাকে যে প্রথম জগদীশ্বরই ছিলেন। সুতরাং তিনি যদি জীব বা বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা নিজ হইতেই

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ও এই সকল সৃষ্ট জীবজন্তু তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। এরূপ জীবজন্তু বা মানুষের অনন্ত নরক ভোগ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? যতদিন ঐরূপ সৃষ্ট মানুষ নিজেকে ভগবানের অংশ বলিয়া মনে না করিতে পারিবে, ততদিনই তাহার নরক ভোগ সম্ভব, কিন্তু অনন্ত-কাল ইহা সম্ভব হয় না, কারণ, সৃষ্ট বস্তু মূল কারণে লয় প্রাপ্ত হইবেই হইবে। তোমরা অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবে যে, কোন শিশু জন্মান্ধ, কিম্বা খঞ্জ, কিম্বা বিকৃতাঙ্গ, কালা, বা বোবা। এইরূপ শিশুর বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা, অথচ তাহার জন্মের পর এমন কোন কাজ করে নাই, যাহার শাস্তিস্বরূপ সে ঐ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে পারে। এখানে পূর্ব্বজন্ম না মানিলে এবং পূর্ব্বজন্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতে হয়, না মানিলে, শিশুর ঐরূপ দুর্ভোগের কোন কারণ নির্দ্ধারণ করা যায় না। কেহ এমন বংশে জন্মগ্রহণ করিতেছে যে, জন্মাবধি সে সকলের সম্মান, আদর ও সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধা পাইয়া আসিতেছে; আবার একজন এমন বংশে জন্মগ্রহণ করিল যে, সকলের নিকট ঘৃণ্য হইয়া, দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করিতেছে; পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করা ব্যতীত, ইহার সঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

১০। হিন্দুধর্ম্ম ও সাম্যবাদ

আমাদের হিন্দু যুবক-যুবতীগণ পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত, রুশদেশে প্রবর্ত্তিত সাম্যবাদের মোহে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা ধন-বৈশম্য এবং শ্রেণী-সংঘর্ষের জন্য হিন্দুধর্ম্মকে দায়ী করেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক।

হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিবার উপদেশ দেয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—উপনিষদের উপদেশ। সুতরাং মানুষের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগের জন্য হিন্দুধর্ম্ম দায়ী নহে। তবে হিন্দুধর্ম্ম বাস্তবকে কখনও উপেক্ষা করে নাই। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ সকলে সমান নয়। সকলের গুণ ও কর্ম্মকুশলতা সমান নহে। এই গুণ ও কর্ম্মের বৈষম্য হেতু প্রথমতঃ চারি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি হয় ; পরে নৈতিক ও সামাজিক বিধান লঙ্ঘন করিবার জন্য অন্য পঞ্চম ও অন্ত্যজ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ও চতুর্বর্ণের জাতিগত বৃত্তি ত্যাগ করার ফলে এই বৈষম্য ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে। পুরাণেও ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির ও ব্রাহ্মণের শূদ্রের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ আছে।

গুণ, প্রকৃতি এবং শক্তিগত বৈষম্য জগতে থাকিবেই।

হিন্দুধর্ম্ম বলে যে, এই বৈষম্য মানুষের কর্ম্মের ফল। আইন করিয়া সব মানুষকে সমান করা যায় না, আজ সমান করিয়া দিলেও, কালই উপার্জ্জন ও কর্ম্মশক্তির বৈষম্য হেতু আবার অসমান হইবে। এবং নূতন অর্থগত শ্রেণী-বিভাগ হইবে।

রুশ প্যাটার্ণের সাম্যবাদে প্রথমতঃ ব্যক্তিগত অর্থ বা সম্পত্তি থাকিবে না, এইরূপ স্থির ছিল; কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করিতে পারা যায় নাই, পরিবর্ত্তিত-ভাবে ঐ মতবাদ গৃহীত হইয়াছে এবং কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত অর্থ ও সম্পত্তি রাখিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

রুশ ও পাশ্চাত্য সাম্যবাদ প্রচারের মূল কারণ—পাশ্চাত্য সমাজে এক শ্রেণীর লোক অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকিত ও অপর এক শ্রেণী সর্ব্বপ্রকার প্রাচুর্য্যের আস্বাদন করিত। অর্থাৎ ভোগের আত্যন্তিক বৈষম্য ছিল।

হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ পালন করিলে, সমাজে অভুক্ত বা নিরন্ন কেহ থাকিতে পারে না।

প্রথমতঃ—হিন্দুধর্ম্ম বলে যে, প্রজাপতি মানুষ এবং অন্য প্রাণীর জন্য যে অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সাধারণ সম্পত্তি। ঐ অন্ন একক গ্রহণ করিলেই অন্যকে বঞ্চনা করা হেতু পাপভাগী হইতে হয়। (বৃহদারণ্যক ১৫।২)। এই জন্য মানুষ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে বিধান

আছে। এই নিয়ম অনুসারে গ্রামে অভুক্ত ব্যক্তি থাকিতে গৃহস্থ ভোজন করিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, রাজার উপর নির্দ্দেশ আছে, তিনি সমস্ত অনাথ, আতুর, বিধবার ভরণপোষণ করিবেন এবং বেকারের উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিবেন। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিবার কোনও কারণ নাই, বরং এই ধর্ম্মের নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হইলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট থাকিবে না। সাম্যবাদ সামাজিক ব্যাধির ঔষধ-বিশেষ ; যদি ব্যাধি না থাকে, ঔষধের প্রয়োজন হইবে না।

১১। হিন্দুধর্ম্ম নিন্দনীয় নহে

তোমরা বড় হইয়া বুঝিতে পারিবে যে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা বিশেষতঃ মুসলমান ও খৃষ্টানেরা আমাদের ধর্ম্মের কুৎসা করিয়া থাকে। যদি সকল হিন্দুদের মধ্যে একতাবোধ থাকিত, যদি তাহারা তাহাদের ধর্ম্মের এবং আচার-ব্যবহারের উপর অন্যের আক্রমণ সহ্য না করিত, এবং তাহাদের নিজেদের রাজা থাকিত, তাহা হইলে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদের ধর্ম্মের কুৎসা করিতে সাহসী হইত না।

বস্তুতঃ এই কুৎসার কোন ভিত্তি নাই। তাহারা

বলে—আমরা পুতুল পূজা করি। আমরা পুতুল পূজা করি না। ভগবানকে ধারণা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা—যাহারা কুৎসা করিয়া থাকে, তাহারাও মানুষ বা অতিমানুষ হিসাবে ভগবানকে ধারণা করিয়া থাকে। মানুষের গুণ, মানুষের ক্রিয়া, ভগবানের উপর আরোপ করিয়া থাকে। মানুষের মনের এই অসামর্থ্যকে হিন্দু স্বীকার করিয়া লইয়া, সহজে ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য, বিভিন্ন গুণ ও কার্য্য অনুসারে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়াছে, এবং সেই কল্পনা অনুসারে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে; মূর্ত্তি বা বিগ্রহ পূজা করিবার পূর্ব্বে, হিন্দুকে মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। অর্থাৎ যেভাবে সে ভগবানকে ধ্যান করিতে চায় —সেইভাবে ভগবান ঐ মূর্ত্তিতে বা বিগ্রহে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা ধারণা করিয়া, ঐ বিগ্রহে ভগবানকে পূজা করিতে হয়। এই তত্ত্ব অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা বুঝেও না, বুঝিবার চেষ্টাও করে না। নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন, যে কেহ ঈশ্বরদত্ত বিশ্বাসে পাথরে চুমা খাইতেছেন, কেহ জেরুজালেমে বা অন্য স্থানে ভগবান থাকেন মনে করেন; কেহ মেরী এবং তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুর মূর্ত্তি বা ছবিকে ভগবান জ্ঞান করেন; কেহ মনে করেন,

ভগবান কখনও শব্দ কখনও অগ্নিরূপে আবির্ভূত হইয়া মানুষের সহিত কথা কহিয়াছেন। সুতরাং পৌত্তলিকতা অল্প বিস্তর সকল ধর্ম্মেই আছে।

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করি ; কারণ, আমরা মনে করি, তাঁহারা মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও, ভগবানের অবতার। অবতারবাদ কেবল হিন্দুদের মধ্যে আছে, তাহা নহে, খৃষ্টানদের মধ্যেও যীশুখৃষ্টকে ভগবান বলিয়া পূজা করেন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে, আমরা পশু পূজা করি, যেমন মহাবীরকে পূজা করি, গো পূজা করি। মহাবীরের গুণাবলী বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার ন্যায় ঐকান্তিক ভক্তি, বীরত্ব, তেজ ও ব্রহ্মচর্য্য, জগতে বিরল। হিন্দু মহাবীরের যখন পূজা করে তখন সে যে ব্যক্তির মধ্যে ঐ সকল গুণের বিকাশ হইয়াছিল, তাঁহাকেই পূজা করে, কোন জীব-বিশেষকে পূজা করে না। গোমাতা আমাদের শরীর পুষ্টির ও অন্ন সংস্থানের সহায়তা করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহার উপকারিতা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার সেবা পূজা করিয়া থাকি। এজন্য হিন্দুর শাস্ত্রে গো-বধ নিষিদ্ধ, এবং গাভীকে দেবতা জ্ঞান করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। উহা গাভীকে পশু হিসাবে পূজা করা নহে। শ্রীশ্রীকালী মাতার বিগ্রহ দেখাইয়া কুৎসাকারীরা বলে যে, দেখ কি বীভৎস

উলঙ্গ মূর্ত্তি, কোন সভ্য জাতি এইরূপ দেবতা পূজা করিতে পারে না। তাহারা ঐ মূর্ত্তি পরিকল্পনার তত্ত্ব জানে না। শ্রীশ্রীকালিকা-মূর্ত্তিতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্ত্রীকে আমরা পূজা করিয়া থাকি। একটু পর্য্যাবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জগতে অসংখ্য জীব প্রতি মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিতেছে, বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে এবং বিনষ্ট জীবগণের ধ্বংসাবশেষ হইতে নূতন জীব জন্মিতেছে, এবং বিনষ্ট জীবের জীবনী শক্তির উৎসবে সহায়তায়, নূতন জীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকৃতির নগ্নরূপ। হিন্দু এই রূপকে কালিকা রূপ দিয়াছে। প্রকৃতি-দেবীকে ভাবিতে গেলে বা তাহার রূপ কল্পনা করিতে গেলে, এরূপ মূর্ত্তিই দিতে হয়।

হিন্দুদিগকে, ও তাহাদের ধর্ম্মকে সভ্য-সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য শিবলিঙ্গ পূজার অপব্যাখ্যা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা করিয়া থাকেন।

হিন্দু ভগবানকেই পূজা করে। তাঁহার বিভিন্ন গুণ, কর্ম্ম ও লীলার স্মারকরূপে মূর্ত্তি বিভিন্ন।

শিবলিঙ্গ পূজা সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের ও জগৎসৃষ্টির পূজা।

"প্রধানং লিঙ্গমাখ্যাতং লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ"

সৃষ্টির প্রথম তত্ত্ব মহৎ (প্রধান)। শিবলিঙ্গ দ্বারা এই মহত্তত্ত্বকে বুঝান হয়। লিঙ্গী পরমেশ্বর।

পরব্রহ্ম বা পরমশিব নিষ্ক্রিয় গুণাতীত। সৃষ্টি রজোগুণের ক্রিয়া এবং সৃষ্টির কারণ শক্তি। সৃষ্টির ইচ্ছা মাত্রেই শিবের অন্তর্নিহিত শক্তি বা মহামায়া প্রকাশিত হন। বস্তুতঃ শিব সর্ব্বদাই শক্তিসংযুক্ত।

শিবলিঙ্গ পূজা পরমেশ্বরের পূজা।

শক্তিসংযুক্ত শিব হইতে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তাঁহাতেই লয় পাইবে।

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

ইহাই শিবলিঙ্গ পূজার প্রকৃত ব্যাখ্যা।

জড়জগতের উর্দ্ধের সত্য যাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য, তাহা বুঝাইবার জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে উপমা দেওয়া সকল ধর্ম্মেই হইয়া থাকে। খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত মিলনের আনন্দ স্ত্রী-পুরুষ-মিলনের (বিবাহ) সহিত উপমিত হইয়াছে।

মিশরীয়, গ্রীক, ও রোমক ধর্ম্মে ঐরূপ প্রতীক পাওয়া যায়। কোন কোন পুরাবিদের মতে সৃষ্টির প্রতীকরূপে লিঙ্গ চিহ্ন, জগতের আদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং তাহাই খৃষ্টীয় ক্রসের পূর্ব্বপুরুষ।

যদি কেহ ঐরূপ প্রতীক পূজার উপর অশ্লীলতার দোষারোপ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহার মনই অশ্লীল। "To the pure all things are pure." শিবলিঙ্গ দেখিয়া বা লিঙ্গ পূজাকালে কোন হিন্দুর মনে কোন অশ্লীল ভাবের উদয় কখনও হয় না। সে জানে যে, শিবলিঙ্গে সৃষ্টির উৎস ভগবানকে সে পূজা করিতেছে।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদের আচার-ব্যবহারের অনেক নিন্দা করিয়া থাকে। যে সকল আচার-ব্যবহার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যাহা কাহারও কোন ক্ষতি না করিয়া হিন্দুর একতা বোধে সহায়তা করে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অনর্থক হইলেও, কদাচ বর্জ্জনীয় নহে। যদি বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে, ধর্ম্মে কোন কদাচার প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়, ও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম দেখিতে হইবে তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইতেছে কি না। সম্প্রতি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা বহুল-ভাবে করা হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রথা প্রবর্ত্তয় করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা কি অবস্থায়, কেন করিয়াছিলেন, জানা যায় না; অনুমান করা যায় যে, তথাকথিত অস্পৃশ্যদের আচার-ব্যবহার এবং অপরিচ্ছন্নতা ও শুচিতার অভাব-বশতঃই ঐরূপ নিয়ম হইয়া থাকিবে। অথবা বিবাহ সম্বন্ধীয় সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে ঐরূপ অস্পৃশ্য করিয়া

শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, উহা ধর্ম্মের বিধান নহে। শুচিতার অভাব হইলে, নিতান্ত আপনার জনও সাময়িকভাবে অস্পৃশ্য হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশের প্রথাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে তথাকথিত অস্পৃশ্যরা আচার-ব্যবহারে শিক্ষায় যেমন উন্নতি করিয়াছে, অস্পৃশ্যতার তীব্রতাও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইয়াছে, এবং হিন্দু রাজা ও ধর্ম্ম-বিধানদাতা থাকিলে, পূর্ব্ব বিধানের পরিবর্ত্তন ঘটিত। পূর্ব্বে জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, নীচ বংশে, দরিদ্র বংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। ইহা ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন এক হিসাবে নিষ্ফল। নীচভাবে থাকিতে বাধ্য হইয়া যে মানসিক কষ্ট হয়, উহা পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল মনে করিয়া প্রসন্ন মনে সহ্য করিতে পারিলে, এই জন্মে মন্দ কার্য্য করার প্রবৃত্তি দমন করিয়া সৎভাবে জীবনযাপন করার প্রেরণা আসিবে, ও পরজন্মে উচ্চ বংশে ও সুখী পরিবারে জন্ম হইবে, অথবা মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর জন্মলাভ হইবে। কেহ যেন মনে না করেন, আমরা অস্পৃশ্যতা সমর্থন করিতেছি। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য অন্যত্র বলা হইয়াছে। আরও অনেকে বলেন হিন্দুধর্ম্মে সাম্যবাদ নাই। একথা সত্য; জাতি বিভাগ হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম ভিত্তি। মুসলমান ধর্ম্মে ও খৃষ্ট ধর্ম্মে মৌখিক সাম্যবাদ আছে বটে, কিন্তু আছে বলিয়াই যে ঐ সাম্যবাদ

হিন্দুকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নহে। প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ভগবানের সৃষ্ট জগতে সকল মানুষ একরূপ শারীরিক বা মানসিক শক্তিসম্পন্ন নহে, এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ও জাতির বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি আছে। সুতরাং ভগবানই মানুষ ও মানুষে প্রভেদ করিয়া দিয়াছেন। জোর করিয়া সকল মানুষকে সমান বলিলে বা করিলে তাহারা সমান হইবে না—অসমানই থাকিয়া যাইবে। তবে যদি হিন্দু কাহাকেও বড় হইতে না দেয়, তখন তাহাকে নিন্দা করা যাইতে পারে; কিন্তু পুরাণাদিতে শূদ্র হইয়াও বেদ ও পুরাণাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করার বৃত্তান্ত লেখা আছে; সুতরাং ঐরূপ কোন অভিযোগ বিচারসহ নহে।

অধুনা যুবকেরা রাশিয়া প্রবর্ত্তিত, সম্পত্তিতে সাধারণের স্বামিত্বকে যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন। অন্ন মাত্রই যে সকলের, সাধারণের ভোগ্য, ইহা উপনিষদ্ শিক্ষা দেয়। এতদপেক্ষা উদার সাম্যবাদ হইতে পারে না।

বলা হইয়া থাকে যে, হিন্দুধর্ম্মে অনেক আজগুবি গল্প আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে, সকল ধর্ম্মেই এরূপ আজগুবি গল্প আছে, আজ দুই পাতা লেখাপড়া শিখিয়া যাহাকে আমরা আজগুবি গল্প মনে করি, বিশ্বাসী ভক্তের নিকট তাহা একান্ত সত্য। ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে সকল ঘটনাই সম্ভবপর। হিন্দুধর্ম্ম যুক্তি Reason কে

কত বড় করিয়া দেখিয়াছে, তাহা যোগবাশিষ্ঠের ২য় খণ্ড ১৮ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ম্ বচনম্ বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিবত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মযোনিনা॥"

বালকে যদি যুক্তিযুক্ত ও হিতকর বাক্য বলে এবং স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মাও যদি অন্য রূপ বহেন, তাহা তৃণের ন্যায় ত্যাগ করিয়া বালকের কথাই গ্রহণ করিবে।

১২। পারিবারিক আচার ও প্রথা

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন আচার বা প্রথার সার্থকতা তোমরা বুঝিতেছ না বলিয়াই তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, এই মনোবৃত্তি অত্যন্ত অনিষ্টকর। যে আচার যে প্রথা কোন সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা নিশ্চয়ই কোন কারণবশতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই আচার বা প্রথা অনুসৃত হইতে থাকায়, এক্ষণে হয়ত কারণ খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য নহে।

হিন্দুধর্ম্মের বিধান এই যে, প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া দন্ত ধাবন করিবে। আমাদের মধ্যে প্রথম প্রথম, যাঁহারা ইংরাজি শিক্ষা ও বিদেশী আচার-ব্যবহারের মোহে মুগ্ধ হইলেন, তাঁহারা শয্যায় থাকিয়া মুখ হাত না ধুইয়া, চা টোষ্ট খাইতে আরম্ভ

করিলেন। পরে ডাক্তারি বিদ্যার ক্রম-প্রসারের ফলে এখন স্থির হইয়াছে যে, হিন্দুদের এই আচার অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, এবং ইংরাজদের আচার স্বাস্থ্যের প্রতিকূল।

হিন্দুশাস্ত্রে সগোত্রে বিবাহ নিষেধ। সম্প্রতি সুপ্রজনন (Eugenics) বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা হইতেছে। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সগোত্রে বিবাহ জাতির অনিষ্টকর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণ এই সিদ্ধান্ত ও পূর্ব্বচলিত বিধান তুলিয়া দিয়া সগোত্রে বিবাহ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর। সর্ব্বদা মনে রাখিবে—হিন্দু বহু প্রাচীন জাতি। সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে, হিন্দু আপন আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, ঐ সকল আচার-ব্যবহার কদাচ ত্যজ্য নহে। আমরা হিন্দুরা মনে করি, যে, যেমন মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি পরিবারেরও বৈশিষ্ট্য আছে, এবং এই তথ্য এখন বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। যদি প্রতি পরিবারের বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহাদের আচার-ব্যবহার পৃথক হইবে এবং পরিবারের সমষ্টি, সমাজ বা জাতিবিশেষের, আচারেও প্রভেদ পার্থক্য থাকিবে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, বরং ঐরূপ বিশিষ্ট আচার ও প্রথা, সেই জাতি, সমাজ ও পরিবারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী মনে করিয়া লওয়াই উচিৎ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, যুধিষ্ঠির তাঁহার পিতামহ

ভীষ্মদেবের নিকট হইতে রাজধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করেন। ভীষ্মের উপদিষ্ট রাজধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট অনেক সময় কঠোর ক্রূর, এবং নির্ম্মম বলিয়া প্রতিভাত হইল, তিনি বলিলেন, এই রাজধর্ম্ম আচরণ করিয়া ধর্ম্ম লাভ করা কঠিন, অতএব আমি তপস্বী হইব। ভীষ্ম তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, তুমি তোমার পিতৃ পিতামহের ব্যবহার ও কর্ম্ম পর্য্যালোচনা কর। তুমি উগ্রকর্ম্ম করিবার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়কুলে, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রাজধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম। তুমি রাজধর্ম্ম আচরণ না করিলে পাপভাগী হইবে।

বংশপরম্পরাগত ব্যবহার, প্রথা, পারিবারিক আচার, বিনা কারণে ত্যাগ করিবে না, বরং উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানিবে।

——

১৩। জাতিভেদ প্রথা

এখনকার সমাজ-সংস্কারগণ, ও হিন্দুধর্ম্মের নিন্দুকগণ, ও বিদেশী ভাবধারার ভাবুকগণ, বলিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ প্রথা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণাপ্রসূত, উহা দূর না

হইলে হিন্দু কখনও একতাবদ্ধ হইবে না, বা তাহাদের কখনও উন্নতির সম্ভাবনাও নাই।

বর্ত্তমানে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এই সমালোচনার ভিত্তি যে একেবারে নাই, তাহা বলা যায় না। বিভিন্ন বৃত্তির উপর সামাজিক মর্য্যাদা নির্ভর করে, এবং এই মর্য্যাদা-বোধ হইতে ক্রমশঃ বৃত্তি উচ্চনীচ হিসাবে বিভক্ত হইয়াছে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় ও সেবামূলক বৃত্তি, যথা ময়লা ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার, সর্ব্বাপেক্ষা নীচ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

হিন্দুর শাস্ত্র কিন্তু সমস্ত বৃত্তিকে জগজ্জননী শক্তি বলিয়া মনে করেন। হিন্দু দেখিয়াছিলেন যে, বংশপরম্পরায় বৃত্তি যদি এক থাকে, পরবর্ত্তী বংশীয়েরা ঐ বৃত্তিতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। তাঁহারা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল বিধিনিষেধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া বৃত্তি বিভাগ অনুযায়ী জাতিভেদের কল্পনা করিয়াছিলেন। কোন বৃত্তির উপর, বা কোন জাতির উপর, ঘৃণা, অবজ্ঞা বা বিদ্বেষের ভাব তখন ছিল না—সকল জাতিই সমাজের এবং রাষ্ট্রের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় ছিল। ক্রমশঃ এই সত্য বিস্মৃত হইয়া হিন্দুর মধ্যে যখন উচ্চনীচ ভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি হইল, একটা অবজ্ঞা এবং ঘৃণার ভাব আসিয়া হিন্দু সমাজকে

সত্য সত্যই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও জাতিতে বিভক্ত করিয়া একতাবোধ লোপ করিয়া দিল। এই একতাবোধ পুনরায় আনিতে হইবে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইবে, যে, জাতিভেদ যখন একতাবোধের অন্তরায়, তখন উহাকে নষ্ট করিতে পারিলে একতাবোধ আসিবে, কিন্তু জাতিভেদ বাদ দিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও তাহার সংস্কৃতি রক্ষা করা দুরূহ। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের, জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মফল ভোগ ও বৃত্তিমাত্রেই জগজ্জননীর শক্তি, এই সকল সত্য পুনরায় প্রচার করিয়া, হিন্দুর মন হইতে পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিদ্বেষের ভাব দূর করিতে হইবে, এবং হিন্দু মাত্রেই যে অমৃতের অধিকারী, তাহার যে গৌরবময় অতীত আছে, ও তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় ভবিষ্যৎও সমুজ্জ্বল হইবে, এই মনোভাব আনিয়া দিতে হইবে। হিন্দু-সমাজের সকল জাতিই রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কাহাকেও বাদ দিতে পারা যায় না, এবং হিন্দুর ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য সকলের সমবেত প্রচেষ্টা আবশ্যক, এই ধারণা সকল শ্রেণীর হিন্দুর, তিনি ব্রাহ্মণই হউন বা অস্পৃশ্যই হউন, সকলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে। পুরাকালে ব্যাধজাতীয় ধর্ম্মব্যাধের নিকট ব্রাহ্মণেরাও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য যাইতেন, সুতরাং কোন ঘৃণার ভাব তখন বর্ত্তমান ছিল না, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। পরস্পরের প্রতি সেই শ্রদ্ধা পুনরায় উজ্জীবিত

করিতে হইবে। এবং প্রত্যেকের মধ্যে হিন্দুত্ব বোধ জাগরিত করিতে হইবে। ৺পুরীধাম প্রভৃতি তীর্থে গেলে হিন্দুত্ব যে একতা ও একজাতীয়তার সহায়ক, তাহা বুঝা যায়।

সৃষ্টির সময় সত্যযুগে মনুষ্য মাত্র একবর্ণ ছিল। তাহারা জন্মিয়াই কৃতকৃত্য হইত, এজন্য সত্যযুগকে কৃতযুগ বলে। ভাগবৎ ১৭ অধ্যায়, ১১শ স্কন্দ, ৮ শ্লোক।

সত্যযুগে মানুষ যথেচ্ছ ব্যবহার করিত ও যে কোনও স্থানে বাস করিত। সত্যযুগ অবসানে মনুষ্য-মধ্যে অধর্ম্ম প্রবেশ করায় তাহারা দস্যুভয় নিবারণ ও শীতাতপ কষ্ট নিবারণ জন্য দলবদ্ধ হইয়া গৃহ-নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। এই সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী বর্ণ আশ্রম ও ধর্ম্মবিধি সংস্থাপন করিলেন।

"মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথাগুণং।

বিষ্ণুপুরাণ ৬।১।৩২

কথিত আছে, বেণ রাজার পুত্র পৃথু প্রথম গ্রাম নগর নির্ম্মাণ করিয়া প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি জন্য আশ্রম ও বর্ণ বিভাগ করেন।

বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ হইলেন। বলবান, প্রজাগণের প্রাণ ও শস্যাদি রক্ষা করিতে সমর্থ ব্যক্তিরা

ক্ষত্রিয় হইলেন। কৃষিজীবি ও পশুপালনকারী বৈশ্য হইলেন। গৃহকর্ম্মকারী ও অন্য জাতির ভৃত্যেরা শূদ্র হইলেন।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে (১৪) ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদেও এই কথাই লিখিত আছে—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং ॥ ১০
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্ম রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ ১১
গোভ্য বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্ম নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ ১২
হিংসানৃত প্রিয়াঃ লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ ১৩

ভাবার্থ—ব্রহ্মা পূর্ব্বে সকলকেই ব্রাহ্মণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাম ভোগপ্রিয় উগ্রস্বভাব সাহসী রক্তবর্ণ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয় হইলেন।

পশুপালনকারী, কৃষিজীবী, পীতবর্ণ দ্বিজগণ বৈশ্য হইলেন।

হিংসাপ্রিয় মিথ্যাবাদী লোভী সর্ব্ব কর্ম্মকারী আচার-ভ্রষ্ট কৃষ্ণবর্ণ দ্বিজগণ শূদ্র হইলেন।

তাহাদের প্রত্যেকের জীবিকার পৃথক উপায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে অপরের সেবা, দাসত্ব বা চাকরী শূদ্র-বৃত্তি ছিল। কালক্রমে এক্ষণে অধ্যয়ন অধ্যাপনের মর্য্যাদা লুপ্ত হইয়াছে, তাহাতে জীবিকার্জ্জন সব সময় হয় না। শূদ্রবৃত্তি এখন ব্রাহ্মণ বহুলভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং সেদিক দিয়া দেখিলে তথাকথিত উচ্চবর্ণের, তথাকথিত নিম্নবর্ণকে ঘৃণা করিবার কোনও কারণ নাই। শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের সহিত তুল্যাসন দেওয়ার ব্যবস্থা, শাস্ত্রে ও মহাভারতে আছে। শান্তিপর্ব্বের ১৮৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যদি কেহ শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হন, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নাভাগ ও অরিষ্টপুত্র নামক ২ জন বৈশ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। হরিবংশ ১১ অধ্যায়। অন্য অন্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এই সকল কথা মনে রাখিয়া, উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণের নিম্নবর্ণের লোকদের আপনজন মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। তথাকথিত নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরা উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে তাহাদের পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করিতেছেন। ইহাও অন্যায়। তাঁহাদের এই আচরণে হিন্দু সমাজের একতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে, এবং হিন্দু সমাজের শত্রুরা ঐ সমাজকে

ধ্বংস করিবার ও হিন্দু-বিরোধী কার্য্য করিবার অবসর ও সুযোগ পাইতেছেন। পূর্ব্বে অপব্যবহার ও দুর্ব্যবহারের জন্য মনে ক্ষোভ না রাখিয়া, যাহাতে হিন্দু সমাজের সকল অংশ পরস্পরের সহযোগে একতাবদ্ধ হইয়া, নিজেদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, দর্শন, উপনিষদ প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জন করিতে পারেন, তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাহাদের মনে করা উচিত যে, এই অত্যাচারী তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা হিন্দুধর্ম্ম ও কৃষ্টি বহু বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানে দেশে যে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে, তাহার মুলে এই উচ্চবর্ণের লোকদের প্রাণপাত চেষ্টা রহিয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাহাদেরও উচ্চবর্ণের লোকের সহিত সহৃদয় ব্যবহার করা উচিত। বুঝা উচিত যে, পরস্পরের মধ্যে ভেদঘটিত হইলে, ব্যক্তিবিশেষের, বা শ্রেণীবিশেষের সামাজিক যে সুবিধাই হউক না কেন, তাহার ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জিত হইবে না, এবং হিন্দু ধর্ম্ম কৃষ্টি বা সংস্কৃতি রক্ষিত হইবে না। তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোক, বা নীচবর্ণের লোক পরস্পরকে এবং পরস্পরের স্বার্থকে যত পৃথক করিয়াই দেখুক না কেন, তাহারা জাতি হিসাবে পরস্পরের আত্মীয়, এবং মহাভারতের উপদেশ অনুসারে আত্মীয় ভেদ হইতে যে ভয় উপস্থিত হয়, তাহা শত্রুভয় হইতেও গুরুতর। শত্রু আমাদের জাতিকে

পৃথকভাবে বা সমষ্টিগতভাবে ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে, যদি এই বিষয়ে আমরা সচেতন হইয়া প্রতিবিধান না করি, পৃথিবীর কোনও শক্তি এই ধ্বংস নিবারণ করিতে পারিবে না।

অনেকে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্ব কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মর্ম্ম উপলব্ধি না করিয়া চতুর্বর্ণ-বিভাগকেই দোষ দেন। চতুর্বর্ণ কেন হইল, এই প্রশ্ন মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্বেও উঠিয়াছিল। ভরদ্বাজ মুনির ঐ প্রশ্নের উত্তরে ভৃগু বলেন, "ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতরবিশেষ নাই···মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা বিভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। অন্যত্র তপস্যার অপকর্ষ-নিবন্ধন উত্তরোত্তর হীন জাতির উদ্ভব কথিত আছে।" শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ ও ২৯৭ অধ্যায়।

১৪। হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম

যদি মনে হয়, হিন্দু বলিতে কোন বিশেষ দেবতা বা দেবতাগণের পূজককে বুঝায়, তাহা হইলে হয়ত ভুল করা হইবে।

হিন্দুত্ব, প্রকৃতপক্ষে জগৎকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, কিরূপে বুঝিতে হইবে, তাহার উদ্দেশ্য কি, জগৎ সম্বন্ধে এবং আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয়ের একটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবধারা ; প্রকৃতপক্ষে ইহা সর্ব্বসাধারণের

ধর্ম্ম এবং সনাতন অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে বর্ত্তমান। হিন্দুত্ব বলিতে যে ভাবধারা বুঝায়, তাহা গ্রহণ করিলে, —ঐ ভাবধারা গ্রহণ সম্বন্ধে কাহারও কোনও বাধা নাই— কোন বিশেষ দেবতা পূজা করার, কোন বাধা নাই। হিন্দুধর্ম্মে সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, কেবল জগৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।

হিন্দুধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্ত্তিত নহে। হিন্দু-ধর্ম্মে অবতারবাদ আছে, কিন্তু অবতারগণ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নহেন। তাঁহারা ধর্ম্ম উদ্ধার ও সংস্থাপন করিয়াছিলেন মাত্র।

হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বভূতে, জড়ই হউক, আর প্রাণীই হউক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। বস্তুতঃ হিন্দুর নিকট কোনও বস্তু জড় নহে। যাহাকে জড় বলি, তাহার চেতনা তমসাবৃত মাত্র।

হিন্দুত্ব বলিতে ব্রাহ্মণকে মানিতে হইবে, বা শ্রদ্ধা করিতে হইবে, বা কোন না কোনও দেবতাকে পূজা করিতে হইবে, এমত বুঝায় না। যিনি সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন, বা করা উচিত মনে করেন, তিনিই হিন্দু; তিনি কোন হিন্দু দেবতাকে পূজা করুন, আর নাই করুন; তবে হিন্দুর কতকগুলি আচার ব্যবহার আছে, সমাজ বন্ধনের জন্য, এবং পরস্পরের পরিচয়ের জন্য, এই আচার ব্যবহারের প্রয়োজন। হিন্দুর উপনিষদ ও

দর্শনে যে সকল তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাই হিন্দু-ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব ও তাহা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালেই সত্য। তাহা চিরকাল ছিল ও চিরকাল থাকিবে। এই জন্য হিন্দু-ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়।

১৫। হিন্দুধর্ম্মের প্রচার

অনেকের ধারণা যে হিন্দুধর্ম্ম ভারতবর্ষে উদ্ভূত এবং ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ। এই ধারণা ভ্রান্ত। পরলোকগত বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার পুস্তকে ("The Arctic Home of the Vedas") লিখিয়াছেন যে, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্ত্তী তুষারাবৃত দেশে বেদের প্রকাশ হইয়াছিল। সাইবেরিয়া দেশে বুরিয়াট জাতির মধ্যে শবদাহ প্রথা প্রচলিত আছে। সভ্য জাতিগণের মধ্যে কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই শবদাহ প্রথা প্রচলিত। আমাদের সমসাময়িক সন্ন্যাসী পরিব্রাজক শ্রীমদ্ সদানন্দ গিরির লিখিত পুস্তক হইতে আমরা অবগত হই যে, জাভা, সুমাত্রা, মলয় উপদ্বীপ, বলী দ্বীপ, ইন্দোচীন এবং কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে বহু হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ঐ ঐ দেশে হিন্দুরাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, এবং বলী দ্বীপ ও শ্যামে এখনও অনেক হিন্দু বাস করেন। ১৯৩৭ সালে বলী দ্বীপনিবাসী একদল নৃত্যকলাবিৎ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই হিন্দু ছিলেন। আমেরিকা

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সকল গবেষণা ও খননকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহাতেও স্থানে স্থানে হিন্দু দেবমন্দির আবিষ্কৃত হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রকি পর্ব্বতমালার সন্নিকটস্থ একটি দুর্গম স্থানে এক শিব-মন্দির আবিষ্কৃত হয়।

জাপানে ব্রহ্মার মূর্ত্তি আছে। পুরাতন মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশে, যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহা হিন্দুধর্ম্ম, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ঐ ঐ দেশে প্রবাদ আছে—শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ নৌকাযোগে সমুদ্র পার হইতে আসিয়া তথায় ধর্ম্ম প্রচার ও রাজ্য স্থাপন করেন। এই প্রবাদ দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হওয়ারই অনুকূল ধারণা করা যায়।

প্রাচীন পারস্য ও আরব অর্থাৎ মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়াতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তথায় মিত্র বরুণ পূজা প্রচলিত ছিল। আরবের একাংশ আসিরিয়া নামে খ্যাত। তথায় অসুর নামধারী রাজাগণ রাজত্ব করিতেন। সিরিয়ার প্রকৃত নাম সুরিয়া; এই নাম হইতে আরবে সুর ও অসুর জাতির বাস ছিল মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

মিশরেও হিন্দু দেবতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আফ্রিকা দেশে কোন কোন স্থানে যাদুকরগণ যে খড়্গ ব্যবহার করেন তাহার আকৃতি ভারতবর্ষের খড়্গের অনুরূপ।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ধর্ম্মও বহুল প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। জন্মান্তরবাদ ভারতবর্ষ হইতে অনেক প্রাচীন জাতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুরা স্বাধীনতা হারাইবার পর বহির্দেশের সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, ও কালক্রমে ভারতবর্ষের বাহিরে যে-সকল হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া যায়, এবং অবশেষে লোপ পায়। হিন্দুধর্ম্মের এই ব্যাপকতা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি এবং জগৎও বিস্মৃত হইয়াছে।

হিন্দুর দর্শন ও উপনিষদ্, জগতের সকল সভ্য জাতি সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দু যুবকগণের এই অতীত গৌরবের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অত্যাবশ্যক, তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা সবিশেষ অবগত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের মত দেশে-বিদেশে হিন্দুধর্ম্মের অমৃত-বাণী পুনঃপ্রচার করুন, ইহাই কাম্য, ইহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

১৬। বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব হিন্দুর অন্যতম অবতার। তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহা মূলতঃ এবং দার্শনিক ভাবে দেখিলে হিন্দুধর্ম্ম। জগতে ঐ মতবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। একসময় সমস্ত এশিয়া খণ্ড, এবং

প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম অহিংসাবাদ প্রচার করায় রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃ আত্মরক্ষায় উদাসীন ও অক্ষম হইয়া পড়ে, এবং বহু প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংস হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর আর সাম্রাজ্য জয়ে মন দেন নাই, অশোকের ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য অন্য কোন সম্রাটের ভাগ্যে হয় নাই, কিন্তু উহাও উপরোক্ত কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—ব্যক্তিই হউক, আর জাতিই হউক, আত্মরক্ষায় উদাসীন হইলেই, তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

বুদ্ধদেব সদাচরণের যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, তাহা যে-কোন ধর্ম্মের, যে-কোন জাতির, ও যে-কোন দেশের গ্রহণযোগ্য ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মতবাদ হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু দর্শন হইতে গৃহীত।

১৭। বেদ, উপনিষদ, দর্শন

সহজ কথায় লোকে বলিয়া থাকে যে, বেদ মানিলে হিন্দু হয়, বেদ হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থাবলী। বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ ইহার গ্রন্থ-কর্ত্তা কেহ নাই, ভগবান ব্রহ্মা হস্তে বেদ লইয়াই পরমেশ্বরের নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হন। বেদ চারিটি,—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদের বিভিন্ন

অংশ আছে ; এক অংশে মন্ত্র আছে, ইহাকে মন্ত্র কাণ্ড, এবং এক অংশে যাগ-যজ্ঞের বিধি লিখিত আছে, ইহাকে ব্রাহ্মণ বলে। ইহারই শেষ অংশ বেদান্ত বা দর্শন, ইহাকে উপনিষদ্ বলে ; বেদের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা উপনিষদ্ই জগৎপ্রসিদ্ধ। ইহাতে চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান ও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। উপনিষদের সংখ্যা অনেক, ইহা পাঠ করিলে ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হওয়া যায়, এবং ইহার ন্যায় যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ মীমাংসাগ্রন্থ, অন্য কোন দেশে, অন্য কোনও ধর্ম্মে কোনও সময় হয় নাই, হইবেও না। যে ধর্ম্মে উপনিষদ্ লিখিত হয়, তাহা কখনও হীন ধর্ম্ম নহে, তাহা সর্ব্বদা যত্নসহকারে রক্ষণীয়। উপনিষদ্ জগতের অতুল সম্পদ, হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ। আর আজ আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্র তাহার ধর্ম্মের অঙ্গ, একাংশ বলা যাইতে পারে সাধারণতঃ হিন্দুর দর্শন ছয়টি ভাবধারার প্রকাশক। তদনুসারে হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্রকে সমগ্রভাবে ষড় দর্শন বলা হয়। এই ছয় প্রকার দর্শনের নাম : মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বৈশেষিক। জগতের দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের স্থান অতি উচ্চে। তোমরা বড় হইয়া দর্শন-শাস্ত্রে উপাধি লাভ করিবে, তখন তোমাদের এই সকল গ্রন্থ পড়িতে

হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, জগতের মনীষীদের মধ্যে এই সকল গ্রন্থ-রচয়িতার স্থান কত উচ্চে। তত্রাচ আমরা তাঁহাদের বংশধর হইয়া আজ যে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হই, ইহা নিতান্তই অদৃষ্টের পরিহাস বলিতে হইবে। তোমাদিগকে এই কথা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে চাই যে, হিন্দুর দর্শন, ও হিন্দুর উপনিষদ্ ভিন্ন জাগতিক ব্যাপারে হিন্দুর যদি আর কোনও দান না থাকিত, আর সমস্ত কীর্ত্তি লুপ্ত হইত, তথাপি হিন্দু শির উচ্চ করিয়া বলিতে পারে যে, আমি হিন্দু, আমার ধর্ম্ম, আমার সংস্কৃতি, আমার দর্শন, আমার উপনিষদ্ জগতে অমূল্য বস্তু ; ইহা আমি প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিব।

অনেকে মনে করে রুশ দেশে যে নব রাষ্ট্র-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই জগতের নূতন ধর্ম্ম। পুরাতন ধর্ম্ম ও নীতিকে আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলিয়া দাও। এই সকল লোক আপন ধর্ম্মের সহিত পরিচিত নহে। যজুর্বেদের অংশ বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে যে, ভগবান সর্ব্ব জীবের জন্য অন্নসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের ভোগ্য। অপরকে পীড়া না দিয়া বা বঞ্চনা না করিয়া কেহ মুখে গ্রাস তুলিতে পারে না। অপরের যাহাতে পীড়া না হয়, এজন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। গৃহী ক্ষুধিতকে অন্ন না দিয়া নিজে ভোজন করিতে পারেন না। করিলে তাহার নরকভোগের ব্যবস্থা আছে। এই শাস্ত্রবাক্য

পালিত হইলে, দেশে দুঃখ-কষ্টের অনেক লাঘব হইত।

১৮। হিন্দুধর্ম্মের সার শিক্ষা

হিন্দুধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম—কাপুরুষের নহে। দুঃখের বিষয়—আমরা হিন্দু হইয়াও ধর্ম্মের আদর্শ কি এবং পুরাকালে হিন্দুরা কেন জগতে বরেণ্য ও পূজ্য ছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

প্রথমতঃ, হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দেয় যে, তোমার দেহ তুমি নহ। দেহ তোমার সাময়িক আশ্রয় বটে, কিন্তু তুমি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অংশ এবং তাঁহাতেই লয় পাইবে। ইহার মধ্যে তোমাকে হয়ত অনেক জন্মগ্রহণ করিতে ও অনেক দেহধারণ করিতে হইবে। শীঘ্র হউক আর বিলম্বে হউক, দুঃখ, কষ্ট, সুখ, ভোগ ও ত্যাগের মধ্য দিয়া আমরা সকলেই এই শেষ পরিণতি প্রাপ্ত হইব। সুতরাং দেহরক্ষা ও উহার পুষ্টির জন্য যে আমরা অধর্ম্ম বা কুকর্ম্মের আশ্রয় না লই এবং দেহরক্ষার জন্য ধর্ম্ম বা আদর্শচ্যুত না হই।

ধর্ম্ম পালনের তুলনায়, দেহ রক্ষা করা যে কত তুচ্ছ, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য শিবি ও কপোতের উপাখ্যান, কর্ণ ও বৃষকেতুর উপাখ্যান, দধীচির উপাখ্যান প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত আছে। শরণাপন্ন কপোতকে শ্যেন পক্ষীর করাল গ্রাস হইতে রক্ষার জন্য মহারাজা শিবি স্বীয় গাত্র হইতে

মাংস কর্ত্তন করিয়া তাহাকে খাইতে দিয়াছিলেন। অতিথির তৃপ্তির জন্য কর্ণ স্বীয় পুত্রকে স্বহস্তে হত্যা করেন। অসুর বধের অস্ত্র নির্ম্মাণ করার জন্য প্রার্থিত হইয়া দধীচি মুনি স্বীয় অস্থি ইন্দ্রকে দান করেন ও উহা হইতে সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ বজ্র নির্ম্মিত হয়। উহা দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন। দেহের উপর অন্যান্য পশুর ন্যায় মানুষের যে মমত্ববোধ আছে, তাহার অসারত্ব প্রতিপন্ন করা ও তাহা দূর করা, এই সকল উপাখ্যানের উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মে বলিদানের যে প্রথা আছে, তাহা এই একই উদ্দেশ্যে বিহিত। জগন্মাতার নিকট তাঁহারই এক সন্তানকে বলি দেওয়া হইতেছে, উদ্দেশ্য—সাধক পশুপাশ অর্থাৎ দেহকে আত্মজ্ঞান ও পাশবিক প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইবেন। হিন্দুর পূজা এবং পূজাঙ্গের উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে পারিলে, এই ধর্ম্মে দেহকে যে কত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করা হয়, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আমাদের মধ্যে যদি হিন্দুধর্ম্ম ও তাহার শিক্ষা বহুলভাবে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে দেহের উপর আমাদের বেশী মমতা থাকিবে না এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আমরা মাথা তুলিয়া প্রাণপণ করিয়া দাঁড়াইতে পারিব। দৈহিক কষ্টকে আমরা কষ্ট বলিয়া মনে করিব না এবং আদর্শ, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মকে দেহ অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া ভাবিতে ও দেখিতে শিখিব। এই এক কারণেই

আমাদের সকলের হিন্দুধর্ম্ম ও তাহার মূল তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুধর্ম্ম মৃত্যুকে ভয় না করিয়া, উহাকে অমৃতের সোপান বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয়। হিন্দুধর্ম্ম বলে, জ্ঞানলাভ হইলে, দেহনাশ ঘটিলেও, আত্মা জন্মমরণ-রহিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করে। যদি সমগ্র হিন্দু জাতি এই আদর্শে প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মত আদর্শনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সাহসী জাতি জগতে আর দ্বিতীয় থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের সত্তা অনুভূতি করিতে শিক্ষা দেয়। জীবমাত্রেই শিব। ইহা অপেক্ষা সার্ব্বজনীনতা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না এবং অন্য কোনও ধর্ম্মে এরূপ আছে বলিয়া জ্ঞাত নহি সত্যই যখন এই শিক্ষা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আমাদের মনে কাহারও প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব থাকা অসম্ভব হইবে এবং জগতে এখন যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান হইয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দেয় যে, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-ভোগ, জীবমাত্রকেই করিতে হইবে। এই শিক্ষা দ্বারাই জগতে যে সকল অসামঞ্জস্য ও আপাতদৃষ্টিতে যে অবিচার দেখা যায়, তাহার মীমাংসা হইতে পারে।

ইহা মানুষকে নিজ অবস্থার জন্য অপরকে দোষী না

করিতে ও নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে এবং সৎকার্য্য করিয়া ভবিষ্যতে তজ্জনিত ফল সুখভোগের অধিকারী হইবার চেষ্টা করিতে শিক্ষা দেয়।

ইহা সমাজে ও সংসারে অশান্তি ও তজ্জনিত দুঃখকষ্ট নিবারণ করে।

অনেকে. বিশেষতঃ যুবকগণ, হিন্দুধর্ম্ম কি তাহা না জানিয়াই এবং হিন্দুধর্ম্মের কোনও পুস্তক বা শাস্ত্র না পড়িয়াই, হিন্দুধর্ম্মই হিন্দুদের দুর্গতির মূল কারণ, এই কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজ ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা ও উদাসীনতা দেখিয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা, বিশেষতঃ মুসলমান ও খৃষ্টানেরা, হিন্দুধর্ম্ম ভারতবর্ষের অভিশাপ, এই বলিয়া সাধারণসমক্ষে বক্তৃতা দিতে ও পুস্তকে লিখিতে সাহস করেন।

হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের উপর এইরূপ অনাস্থা প্রকাশ করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই নূতন রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যবাদপন্থী বা Communists। জগতের দুঃখকষ্ট দেখিয়া ভগবান বুদ্ধ রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যান। আমাদের যুবকগণ যে দুঃখকষ্ট দেখিয়া সাম্যবাদ-পন্থী হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মকে আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলিয়া দিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত।

১। হিন্দুধর্ম্ম একমাত্র ধর্ম্ম, যাহা অন্য ধর্ম্মমতের সহিত

বিবাদ না করিয়া বলে,—যে যেভাবে ভগবানকে সাধনা করে, সে সেইভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

২। হিন্দুধর্ম্ম একমাত্র ধর্ম্ম, যাহা সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন শিক্ষা দেয়।

৩। স্বকৃত কার্য্যের ফলভোগ করিতেই হইবে, ইহা হিন্দুধর্ম্মেরই শিক্ষা।

৪। অন্ন বা ভোজ্য মাত্রই, জীবগণের সাধারণ সম্পত্তি, ইহা হিন্দুর উপনিষদ্ শিক্ষা দেয়, উপনিষদ্ আরও বলে যে, পরপীড়ন বা অপরকে বঞ্চিত না করিয়া এক গ্রাস অন্নও কেহ মুখে তুলিতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১ম অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ, ২য় শ্লোক।

৫। উপরের দফায় লিখিত পাপ-ক্ষালনের জন্য প্রত্যেক হিন্দু পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। অতিথি অভ্যাগত এবং পশুপক্ষীকে স্বীয় আহার্য্য হইতে অংশ দেওয়া এই যজ্ঞের অন্যতম।

৬। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রাজা (বা রাষ্ট্রনায়ক বা রাষ্ট্রশক্তি) অনাথ, দীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের জীবিকা নির্দ্দেশ করিতে উপদিষ্ট (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৮৬ অধ্যায়)।

৭। যতই চেষ্টা করা যাউক, লোকের মধ্যে দৈহিক, মানসিক ও চরিত্রগত প্রভেদ থাকিবেই। ইহার মধ্যে কতকগুলি জন্মগত। এই প্রভেদের জন্য মানুষের অবস্থা

ও উপার্জ্জনের প্রভেদ ও পরস্পর মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। সকলকে নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, অনেক অশান্তি প্রশমন করা যায়। মানুষ নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করিবে না, তাহা বলিতেছি না। হিন্দুধর্ম্ম একমাত্র ধর্ম্ম, যাহা কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ প্রচার দ্বারা, নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্য কার্য্য করিতে শিক্ষা দেয়।

৮। আমাদের দেশে হাজারে ৯৯৯ জন লোক ভগবানে বিশ্বাসী। সুতরাং তাহারা কোন না কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এ অবস্থায়, যে ধর্ম্মে বিরোধ প্রশমন করে, মানুষকে নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে বলে, এবং পরের ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে নিষেধ করে, সেই ধর্ম্মই অবলম্বনীয়।

৯। হিন্দুধর্ম্মের যে সকল উপনিষদ্ ও দর্শন আছে, তাহা সভ্যজগতের অমূল্য সম্পদ। হিন্দুধর্ম্মের অন্য কোন অবদান না থাকিলেও, কেবল তাহার উপনিষৎ ও দর্শনের জন্য উহা জগতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপেই প্রতিষ্ঠা পাইবার অধিকারী।

১৯। কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে উপদেশ

১। তোমাদের মধ্যে অনেকের হয়ত অবস্থা ভাল নহে, এবং লেখাপড়া ছাড়িয়াই হয়ত অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। পঠদ্দশা হইতেই জীবনের লক্ষ্য স্থির

করিবে কোন্ পথে যাইবে, চাকুরী করিবে, না স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিবে, ও করিলে, কি বৃত্তি অবলম্বন করিবে। যে পথই অবলম্বন কর, তদুপযোগী শিক্ষা লাভের চেষ্টা করিবে।

২। মনে রাখিবে যে, চাকুরীর সংখ্যা বেশী নহে। ১টি পদ খালি হইলে ১০০ প্রার্থী হয়। পারিলে চাকুরীর চেষ্টা না করাই ভাল।

৩। ভগবান সকলকে যে মূলধন দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তাহা এই :—

(ক) নিজের শরীর ;

(খ) নিজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ;

(গ) মাটি বা প্রাকৃতিক সম্পদ।

৪। সর্ব্বদা শরীর সুস্থ রাখিবে ও শরীরচর্চ্চা করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিবে। কদাচ পরিশ্রম করিতে বিমুখ হইবে না।

৫। বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবে। শিক্ষা দ্বারা ও শিক্ষিত লোকের সংসর্গে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিবে। সংশয় উপস্থিত হইলে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানী লোকের নিকট পরামর্শ লইয়া সংশয় দূর করিবে।

৬। মাটি বা প্রাকৃতিক সম্পদ ভগবানের দান হইলেও, বর্ত্তমানে যে আইন আছে এবং বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া যে

ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সকলের অধিকার এখন নাই।

ভূস্বামী যাঁহারা, তাঁহারা নিজের মাটি হইতে শস্য বা অন্য সম্পদ উদ্ধার করেন না। অন্যের দ্বারা করান। যাহারা শস্য উৎপাদন ও প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধার করে, তাহাদের জীবিকা তাহাতে চলে।

ক্রমশঃ এমন সময় আসিতেছে যে, ভূমি যাঁহারা কর্ষণ করেন না, তাঁহাদের স্বামীত্ব লুপ্ত হইবে।

যাহাদের নিজের জমি আছে, নিজেদের চাষের ব্যবস্থা করা, তাহাদের অবিলম্বে কর্ত্তব্য।

যাহাদের নাই, তাহাদের অবিলম্বে জমি সংগ্রহ করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এখনও দেশে বা দূর দেশে জঙ্গল জমি, পতিত জমি আছে।

৭। দেশের যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, তাহার অতি অল্প জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে। আরও অনেক জিনিষ আছে, যাহা সন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

সে দিকেও চেষ্টা করিলে জীবিকার উপায় হইতে পারে।

৮। যুবক ও বালিকাগণের উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। পুরুষের ২০—৩০ এবং বালিকাদের ১২ (এক্ষণে আইন করিয়া ১৪)— ২০ বৎসর বিবাহের কাল। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ করে।

৯। বিবাহ দিয়া বৈবাহিকের পয়সায় বা বরকন্যার পণে কেহ বড়লোক হয় নাই। সুতরাং বরপণ বা কন্যা-পণের জন্য সমাজে বিবাহ কষ্টসাধ্য যাহাতে না হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য।

১০। অনেক যোগ্য পাত্র বা পাত্রীর পিতা, বিবাহের পর কন্যার কষ্ট হইবে, বা স্ত্রীকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিবে না, এই ভয়ে বিবাহ দেন না। ইহাও ভীরুতা বা কাপুরুষতার নামান্তর। সমাজ রক্ষা করিতে গেলে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা প্রয়োজন, এবং বিবাহ করিলে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা আসে, ও পুরুষকারের বিনাশ হয়।

১১। কর্ম্মক্ষেত্রে ভালভাবে কাজ করিলে, ও সহকর্ম্মীর সুখদুঃখে সমবেদনশীল হইলে, সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাওয়া যায়।

১২। সর্ব্বদা কার্য্য করিবার উৎসাহ করিবে, কদাচ পরের উপর নির্ভর করিবে না বা দৈবের উপর নির্ভর করিবে না।

দৈব প্রবল বটে, কিন্তু পুরুষকারের সহায়তা ভিন্ন দৈব সম্পূর্ণ ফল দেয় না। পুরুষকার দ্বারা দুর্দ্দৈব কতক পরিমাণ খণ্ডন করা যায়।

কারণ এই যে, যাহাকে দৈব বলা যায়, উহা প্রাক্তন কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছু নহে, নূতন কর্ম্ম দ্বারা পুরাতন কর্ম্মফল ক্ষয় করা বা বর্দ্ধিত করা সম্ভব।

১৩। মনে রাখিবে তোমরাই দেশের ভাবী নেতা। নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে যাহাদের নেতৃত্ব করিবে, তাহাদের সহিত, তাহাদের সুখদুঃখ ও মনোভাবের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিবে।

১৪। অন্যান্য জীবজন্তুর সহিত মানুষও পশু-পর্য্যায়ভুক্ত। তোমরা অনেক বিভিন্ন সার্কাসে দেখিয়াছ পশুপালকেরা কত হিংস্র জন্তুকে কেমন বশ করিয়াছে। ঐরূপ মানুষকেও বশ করা সম্ভব।

নেতৃত্ব করিতে গেলে তোমাদের মানুষ বশ করিতে হইবে। নেতৃত্ব করিতে গেলে ত্যাগ ও সততা আবশ্যক। উহাতে আকর্ষণী ক্ষমতা জন্মে। সাধারণতঃ অপরের সুখ-দুঃখে সহানুভূতিশীল হইলে, তাহাদের আপদে বিপদে সাহায্য করিলে, তাহাদের জীবিকা সংস্থানে সাহায্য করিলে, তাহারা আপনা আপনিই তোমার বশীভূত হইবে। যাহাদের নেতৃত্ব করিবে, তাহাদের সহিত যদি মেলামেশা না কর, তাহাদিগকে আপনার জন মনে না কর, কখনও নেতৃত্ব করিতে পারিবে না।

১৫। তুমি নিজে যে বিষয় জান না, তৎসম্বন্ধে উপদেশ যাহারা জানে তাহাদের নিকট লইবে। নিজ পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে, এই মনে করিয়া উপদেশ গ্রহণে বিরত হইবে না।

তোমার অপেক্ষা নিম্নপর্য্যায়ভুক্ত বা নিম্নপদস্থ লোকের নিকট ঐরূপ উপদেশ গ্রহণে দ্বিধা করিবে না।

১৬। যাহার নিকট উপদেশ লইবে, সে ধর্ম্ম সম্বন্ধে হউক, শিক্ষা সম্বন্ধে হউক, সমাজ বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে হউক, তাহাকে গুরু বলিয়া মানিবে এবং তাহার সহিত সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিবে।

১৭। মনে রাখিবে জগতে কোন কার্য্য, কোন চিন্তা, বৃথা যায় না। কোন না কোনও সময়ে অচিন্তিতভাবে উহা কাজে লাগে।

১৮। কদাচ কোনও মানুষকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিও না। যাহাকে অপাতঃদৃষ্টিতে ঘৃণার বা অবজ্ঞার পাত্র মনে কর, হয়ত তাহার অবস্থায় পড়িলে তোমারও ঐরূপ দশা হইত।

১৯। সর্ব্বভূতে ভগবান আছেন মনে করিয়া কাজ করিবে। কোন জীবজন্তু বা মানুষের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না। তবে, যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ না করিলে হয় না, কারণ যুদ্ধ এবং শত্রুর প্রতিরোধ ক্রুরকর্ম্ম।

২০। নিজের, স্বজাতির, স্বদেশের জন্য, এবং নারীর সতীত্ব ও নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করার জন্য, নিজের বা স্বজাতির অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বা আততায়ীকে প্রতিরোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি প্রহৃত হইতে হয়, বা

জীবন পাত করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। উহাতে তোমার পুণ্য সঞ্চয়ই হইবে। অন্যথায় পাপভাগী হইবে।

২১। হিন্দুধর্ম্মে জাতিবিভাগ আছে। কিন্তু অস্পৃশ্যতা বহু পরের সৃষ্টি। উহা এখন সমাজের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। সামাজিক শাসন হিসাবে ঐ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে উহার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সকল জাতিই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া, অপর জাতির সহিত সহৃদয় বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবে।

২২। এখন আমাদের দেশেও বণিক হিসাবে বিভিন্ন দেশবাসীর আগমন হইয়াছে। হয়ত উহাদের সংস্পর্শে তোমাকে আসিতে হইবে। তাহাদের আচার ব্যবহার মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেই তাহাদের সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে।

২৩। তোমার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, তোমার বিবেকে আঘাত লাগে, তোমার আত্মমর্য্যাদা নষ্ট হয় বা স্বজাতির বা স্বধর্ম্মের গ্লানি হয়, এরূপ কাজ কখনও করিবে না।

২৪। মনে রাখিও সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না থাকিলে জগতে শান্তিভোগ করা যায় না। যে শক্তি সঞ্চয় না করিয়া নিরুপদ্রবে জীবনযাপন করিতে চায়, তাহাকে

পরের দাসত্ব করিতে হয়। যে নিজ অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেষ্ট নহে, তাহার অধিকার অপহৃত ও নষ্ট হয়।

২৫। মনুষ্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে না হইতেই মৃত্যু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে. অতএব পরদিনের কার্য্য অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

২৬। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের রাজনীতি শিক্ষা ও রাজনীতি পালন করিতে হইবে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে রাজনীতি বর্ণিত হইয়াছে, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা, কেবল আমরা কেন, আমাদের রাজনৈতিক নেতারাও উহার সহিত পরিচিত নহেন। আমাদের পৈত্রিক হীরকালঙ্কার থাকিতে আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে চাকচিক্যময় কাঁচের গহনা ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাদের নিকট অনুরোধ যে, পাশ্চাত্য রাজনীতিতে পাণ্ডিত্য লাভের চেষ্টার পূর্ব্বে নিজেদের শাস্ত্র পড়িয়া দেখ। দেখিবে যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহ তোমাদের রাজনীতি-শাস্ত্র হইতে কত ঋণ লইয়াছে, ওই রাজনীতি এখনও কিরূপ সময়োপযোগী।

২৭। রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ আছে যে, আগে চিত্তজয় (মন ও ইন্দ্রিয়সংযম) করিয়া পরে অরিজয়ে

প্রবৃত্ত হইবেন। প্রজাদের উপার্জ্জিত অর্থের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়া (Tax) তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, অপরিমিত কর গ্রহণে গাভীর স্তন ছেদন করা হয়।

বিচারালয়কে ধর্ম্মাধিকরণ (অর্থাৎ যে স্থানে ধর্ম্মের অধিকার) বলিত। মুসলমান শাসনকালে উহাকে আদালত এবং ইংরাজ শাসনকালে Court অর্থাৎ রাজসভা বলিত। এই নামের পার্থক্য বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। আমাদের হিন্দু আদর্শ যে কত উচ্চ ছিল, এই নামই তাহার পরিচায়ক।

উপদেশ আছে, বিচারকালে কাহারও (এমন কি রাজার পুত্রের) প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

আইনকে ব্যবহার-শাস্ত্র বলিত। উহার সংজ্ঞা এইরূপ ছিল—যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রচার হয়, তাহাকে ব্যবহার বলে। আরও কথিত আছে—দুর্ব্বলের নিমিত্ত রাজার সৃষ্টি। রাজা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।

১৮। সন্দেহসঙ্কুল জ্ঞান থাকা না থাকা সমান। সন্দেহ উন্মূলন করিবে। শান্তিপর্ব্ব, ১৪২ অধ্যায়।

১৯। উপদেশক ও প্রচারক হইতে হইলে মরুভূমিতে জলান্বেষী কূপ খননকারীর ন্যায় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে—খননকারী যেমন আর্দ্র বালু দেখিতে না পাওয়া পর্য্যন্ত খনন করেন, উপদেশকও

তেমনই শ্রোতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশবাক্য মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আরম্ভ না করে, ততক্ষণ নিবৃত্ত হইবেন না। তিনি সমবেত জনসাধারণ-মধ্যে নিজেও একজন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, তাহাদের মনে যে প্রশ্ন ও ভাব উদয় হওয়া সম্ভব, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপদেশ দিবেন। তাহা হইলে তিনি অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন।

সমাপ্ত